উৎস মানুষ

৩৩ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
ভেজালে ভেজালে ছয়লাপ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
একনজরে দাভোলকর	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৫
প্রস্তাবিত খসড়া	নরেন্দ্র দাভোলকর	৬
ঈশ্বর-পত্র, ১৯৫৪	ডি	৮
ফ্যাশিবাদের ছাঁটাই	নরেন্দ্র দাভোলকর	১০
বিশ্বাস: কুসংস্কারের উৎস	সুমন ওকে	১২
দধীচি দাভোলকর	আশীষ লাহিড়ী	১৬
প্রতিবাদে সামিল		১৮
জৈব ফসল	কৌশিক মজুমদার	২০
মন্ত্রের প্রসাধন	জয়ন্ত দাস	২২
ওষুধ যখন নুনজল	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৫
এক জ্যোতিষ্ক ও তার আবিষ্কারক	সমীরকুমার ঘোষ	২৮
চিঠিপত্র		৩০
সংগঠন সংবাদ	সতীশচন্দ্র মণ্ডল	৩১

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

দাভোলকরের মৃত্যু ত্ত কিছু প্রশ্ন

কুসংস্কার ত্ত অন্ধবিশ্বাস তাড়াতে শিয়ে খুন হয়ে শেলেন ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকার।

ব্রুনো, সক্রেটিস থেকে আমাদের চাবস্কিক- অনেককেই মরতে হয়েছিল যুক্তির পক্ষ নিতে শিয়ে। আব্রাহাম কোভুর বা বি প্রেমানন্দের ভাশ্য ভাল যে তাঁদের খুন হতে হয় নি। বৈষ্ণব বলতেই আমাদের কপালে তিলক কাটা প্রেমের পূজারীর ছবি ভেসে ত্তঠে। কলসীর কানা দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেত্ত জশাই-মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল নিতাই। কানে দিয়েছিল কৃষ্ণনাম। সে হেন নিমাই সন্ন্যাসীকে খুন হতে হয়েছিল। আর 'অবতার'-এর খুন-রহস্য উন্মোচন করতে শিয়ে খুন হন শবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায়। সেখানে আর প্রেমফ্রেম চলে নি! চৈতন্য নিয়ে মুখ খুলে বিশিষ্ট আয়ুবেস্কিাচাযস্ক ত্ত পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরকে অনেকদিন পুলিশ পাহারা নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাতায়াত করতে হয়। বৌদ্ধ জাতকের শল্প অনুযায়ী রাম-সীতা ভাইবোন বলায় প্রাণনাশের হুমকি দেত্তয়া হয়েছিল আচাযস্ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে দাভোলকরকে খুন হতে হবে এ আর নতুন কথা কী!

প্রসঙ্গত দুটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে শপথগ্রহণ করলেন পি সদাশিবম। ১৯ জুলাই। তাঁর শপথগ্রহণের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা ১১টায়। তার আশে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় নতুন পদের জন্য অভিনন্দন জানাতে ত্তঁকে ডেকে পাঠান। সেই সময়েই সদাশিবম রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন, সময়টা এশিয়ে সকাল সাড়ে নটায় করার জন্য। ত্তঁর প্রথম যুক্তি ছিল, ত্তই সময়ে করলে সুপ্রিম কোর্টের কাজকমের্স ব্যাঘাত ঘটবে না। দ্বিতীয় যুক্তিটাই ছিল মোক্ষম। মান্যবর সদাশিবমজি জানান,

শুক্রবার বেলা ১০-৩০ থেকে ১২টা পযর্ন্ত সময়টা শুভ নয়। ত্তই সময়টা রাহু কালাম। রাষ্ট্রপতি ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি একবাক্যে যুক্তি মেনে নিয়েছেন।

অন্য ঘটনাটি ১৮ সেপ্টেম্বরের। ঘটেছে হরিয়ানার রোহতকে ঘরনাবতী গ্রামে। রোহতক আবার ত্তখানকার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুদার শহর। বছর ২০-র নিধি বারিক এবং ২৪ বছরের ধমের্ন্দ্র বারিক মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল বিয়ে করার জন্য। নিধি চারুকলার ছাত্রী। সম্পন্ন বাড়ির মেয়ে। ধমের্ন্দ্র কারি*রি শিক্ষার ছাত্র, এক *রিব চাষীর ছেলে। নিধির বাড়ি থেকে জানতে পেরে ত্তদের বিয়ে দেত্তয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে বলে। বাবা-মায়ের কথায় বিশ্বাস করে নিধিরা পরদিনই ফিরে এসেছিল। বিয়ে দেত্তয়া নয়, নিধির বাড়ির লোকেরা গ্রামের আর পাঁচজনের সামনে ত্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ধমের্ন্দ্রর ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলা হয়। তবে তার আ* চাষের কাছে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দিয়ে মেরে তাঁর হাত-পা ভেঙে দেত্তয়া হয়েছিল। এসব যখন হচ্ছে তখন ধমের্ন্দ্রর বাড়ির লোকেরা কেউ ছেলেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে নি! দুটো মৃতদেহই গ্রামের এক কোণে ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে নিধির দেহ পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টার সময় পুলিশ তার পরিবারের লোকজনকে ধরে। নিধির বাবা বিল্লুর মেয়েকে মেরে ফেলায় কোনো অনুশোচনা নেই। পাষণ্ড বাপের বক্তব্য, আমার কোনো দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে এমন কাজ আবার করব!

এর পর আশা করা যায়, দাভোলকরকে খুন করার কারণ কেউ খুঁজতে বসবেন না। কারণ...

আহরণ

ভেজালে ভেজালে যখন ছয়লাপ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেজাল এখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রের শিরোনামে। আসলে ভেজালের দৌরাত্ম্যে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই, চায়ের কাপে, ভাতের থালায়, রোগীর ওষুধে, কীসে নয়? অথচ এ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা খুব কম। চেতনাতেও আমাদের বিস্তর ভেজাল।

এগারো বছরের প্রাণবন্ত বালক পৃথ্বীশ যখন বিদ্যাসাগর হাসপাতালে অবশ পায়ে উঠে দাঁড়ানোর অক্ষম চেষ্টা করে, যখন মন্ত্রীর অনুদান হাত পেতে নেওয়ার শক্তি পায় না অসাড় আঙুলে তবু সেই হাতেই বন্দুক কিনে এনে ভেজালদারকে গুলি করে শাস্তি দেওয়ার অকপট স্বপ্ন ঘোষণা করে জনে জনে ডেকে ডেকে— তখন বাস্তবিকই চোখে জল আসে বেদনায় লজ্জায় ক্ষোভে।

'ক্ষোভ না হয় আছে, বিক্ষোভ নেই কেন? নিরীহ মানুষ বিনা অপরাধে মরে তবু ছোট্ট পৃথ্বীশের ক্রোধ দাবানলের মতো বিক্ষোভ হয়ে ছড়ায় না কেন?'— কথাগুলো ফস্ করে ছুঁড়ে দিয়ে যায় মনের ভেতরকার সেই তোতাপাখীর নিন্দুক।... সত্যিই তো, ভেজাল তেলের ব্যাপক বিষক্রিয়ার খবরে কলকাতার রোজকার বাতাস ভারী হয় তবু প্রতিবাদ জ্বলে ওঠে না, যন্ত্রণা ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হয় না। হ্যাঁ, মিছিল স্লোগান হয়েছে, অফিস ভাঙচুর হয়েছে, কুশপুতুল পুড়েছে, মন্ত্রী-নেতা-মাতব্বরদের বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির ফুলকি ছুটেছে, কিন্তু কে না জানে এ সমস্তই রাজনৈতিক নাটমঞ্চের উতর-চাপান, দীর্ঘস্থায়ী কোনও আলোড়ন নয় এবং তা-ও হঠাৎ করে এমন চরম বিপর্যয় ঘটে গেল বলেই।

আবার কোত্থেকে এসে নাক গলায় নিন্দুক— 'কী-ই বা হবার আছে! ভেজাল কি আর নতুন কিছু? উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কোথায় না ভেজাল? দিব্যি আছি সবাই, মরছি না তো! কাজেই অত ল্যাঠার মধ্যে জড়িয়ে কাজ কী, চলছে চলুক।'

কথাটা নিন্দুকের, কিন্তু বেজায় সত্যি। বড় আশ্চর্যের জীবন-যাপন আমাদের। একবার টনক নাড়িয়ে দেখুন দেখি রোজনামচাটা— ঘুম ভাঙতে বড় আরামে হাই তুললেন, অমনি দূষণ-মাখা ভেজাল বাতাস ঢুকে পড়ল

টুক্ করে শরীরে। মুখ-হাত ধোবেন কলে— ইদানীং কেঁচো আর ক্ষুদে সাপের বাড়াবাড়ি কমলেও জলে অবাঞ্ছিত মিশেলের আকাল যে নেই তা বলা বাহুল্য। এরপর অল্প খানিকটা বিলাসিতার স্বাদ, এক কাপ চা; না জানা থাকলে ভাল যে, যথেষ্ট দামের চা-পাতাতেও চামড়ার গুঁড়ো, ব্যবহৃত শুকনো চা-পাতা, পেঁপের বিচি মেশানো হয়। থলে হাতে বাজারে আসুন, মাছপট্টিতে কঙ্গো রেড আর রোডামিন রঙে রাঙানো কান্‌কো দেখিয়ে মাছকে তাজা সাজানোর সোচ্চার চেষ্টা। পাশে সব্জি বাজারেও তাই, তুঁতের জল আর বিষাক্ত সবুজ রং সহযোগে নকল-টাট্‌কার পসরা। মুদির দোকানে? তেলের কথা নতুন করে বলার নেই— শেয়ালকাঁটা, টি সি পি, খনিজ তেল, তুলোর বীজের তেল, ভেজালে বাদ নেই কিছু। আর সেই সঙ্গে সরষের তেলে ঝাঁঝ আনতে বিপজ্জনক অ্যালাইল আইসো-থায়োসায়ানেট আর 'ভালো তেলের' রং আনতে বিবিধ বিষাক্ত রাসায়নিক তো আছেই! মশলাপাতি কম কিনলেও নিদেন পক্ষে লঙ্কাগুঁড়ো— বাজে রং ছাড়াও ইটের গুঁড়ো, মিহি বালি থাকতে পারে ওতে। ধনে গুঁড়োতে খুদ, কখনো বা ঘোড়ার শুকনো মলও পাওয়া গেছে। গোলমরিচ দেখে চোখ নাচছে? ওগুলো প্রায়শই কেরোসিন বা ডিজেল তেলে পালিশ করা থাকে। খাবার পাতে আধ চামচ খাঁটি ঘি খাওয়ার বে-আক্কেলে বাসনাটা রয়ে গেছে, কিন্তু ওতে হরদম ডালডা, মিষ্টি আলুচূর্ণ, মায় চর্বিও মেশানো থাকতে দেখা যায়, টের পাওয়া দুষ্কর। মাখনেও একই রকম ফাঁকি চলে। টিফিনে আটার রুটি কিংবা ময়দার পরোটা খাবেন— কে জানে কত ভাগ তেঁতুল বিচির গুঁড়ো আপনার পেটে যাবে (মনে পড়বে ১৯৪৮-এ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভায় সেই ভেজাল আটা কেলেঙ্কারির কথা)। অফিস ফেরতা ছেলেমেয়ের জন্য নানারঙের লজেন্স কিংবা পেপসি নিয়ে যাওয়ার মানে কিন্তু 'কেশরী' বা মেটালিন ইয়েলো, লেড ক্রোমেট, কারমাইসিন ইত্যাদি বিষাক্ত রং বাচ্চার মুখে তুলে দেওয়া। রঙিন যে কোনও খাবার বা মিষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। যদি বা সাবধানী হয়ে রং বাদ দিয়ে ক্ষীর বা রাবড়ি কিনলেন শখ করে, তাতে ব্লটিং পেপার মেশানো কি না কে বলতে পারে? এত কিছুর পর দিনশেষে দুঃসহ মানসিক চাপ কাটাতে একটা ঘুমের বড়ি খাবেন— নিস্তার সেখানেও নেই, ভেজাল ওষুধ তো ছেয়ে আছে বাজার জুড়ে।

এই যে উদয়াস্ত ভেজালের সঙ্গে সহবাস, এক সাবলীল অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাই আচমকা বড়সড় দুর্ঘটনা বা প্রাণসংশয় না হলে আমাদের স্থবির মনের ঘুম ভাঙে না। এ হেন ভেজাল কালচারের অভ্যেস কতকাল ধরে চর্চিত হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। পরশুরামের শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড-এর গণ্ডেরিরাম মার্কা ব্যবসায়ীকুলের সত্যিকারের বয়স কত জানা নেই, তবে দু'হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বাটপাড়, জালিয়াত ভেজালদারের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে। যাঁরা ভেজালদারিকে শুধুই বর্তমান জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়ের সূচক বলে ফরমান দেন এবং বড় আক্ষেপে ইংরেজ শাসনের সুবর্ণময় স্মৃতি রোমন্থন করেন তাঁদের মনে করানো যায় যে, গত তিরিশের দশকে কলকাতায়, ব্রিটিশ সূর্যের ছত্রছায়াতেই, বেরিবেরি রোগ মহামারির আকার নিয়েছিল সর্ষের তেলে শেয়ালকাঁটার ভেজাল থেকে, শাস্তি কিছুই হয়নি। কাজেই এ দেশে ভেজালের এক প্রাচীন ঐতিহ্য আছে বটে এবং ঐতিহাসিকভাবেই ভেজাল-প্রবাহ ব্যাপক জনমানসে চরম সহনশীলতা ও নির্লিপ্ততার গ্যারান্টি আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু কেন এই মেনে নেওয়া? মনে হয় এর প্রেক্ষাপটে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক কারণগুলে মিশ্রভাবে ক্রিয়াশীল।

প্রথমত, সহজ হিসাবে, ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য বাজারে সর্বদা মেলে না বলেই লোকে ভেজাল কিনে খায়। ব্যবসায়ীদের ভেজাল টেকনিক তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশে চাহিদার তুলনায় জোগানের লাগাতার ঘাটতি এবং মাত্রাহীন মুনাফার অবাধ সামাজিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে। অতঃপর সে ভেজাল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে, রাজনৈতিক দলগুলির অপদার্থতায় এবং সর্বোপরি ব্যাপক মানুষের অজ্ঞতা, সহনশীলতা ও আত্মবদ্ধতার চমৎকার অভ্যাসকে মূলধন করে। তা বলে কি সাধারণ মানুষ ভেজালদারের শাস্তি চায় না? চায় বৈ কি।

কিন্তু বাস্তবে কিছুই তো হয় না এখানে। ভেজালদারের শাস্তি হয় না, ক্ষতিগ্রস্তের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ হয় না, ভেজাল প্রতিরোধের কোনও সৎ কার্যকর প্রয়াস নেওয়া হয় না। দেশে প্রশাসন আছে, আইন আছে, গালভরা সংসদীয় ভাষণ আছে, কিন্তু সবই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। যে মুষ্টিমেয় জনসমষ্টির আর্থিক সংগতি কিছু বেশি তারা নামী ব্র্যান্ডের সিল্‌ড্ তেল আর দামি আনাজ-মশলা কিনে, বড় কোম্পানির ওয়াটার ফিল্টার বসিয়ে, খাদ্যাভ্যাসে কঠোর শাসনবিধি পালন করে পরিত্রাণের বিচ্ছিন্ন চেষ্টা চালায়। এই চেষ্টায় একা-একা নিজে বাঁচার তাগিদ থাকে, ব্যাপক মানুষের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের সুযোগ থাকে না।

এই সুযোগে নিন্দুক মনের ঝোপে গলা বাড়ায়— 'সহ্য করা, ক্ষমা করা, কামনা পরিহার করা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই ফসল, বেদান্ত-পুরাণ-অধ্যাত্মবাদের দেশ, প্রেম-দয়া-তিতিক্ষার দেশ এই ভারতবর্ষে সহনশীলতার গৌরবকে ছোট করে দেখা কেন?'

আবারও ধন্ধ লেগে যায় মনে। সত্যিই হয়তো আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য মানুষের নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত মনে কিছু মাত্রাতেও ইন্ধন জোগায়। যেন নিয়তিবাদ আর অদৃষ্টবাদের ক্ষীণ সুর শোনা যায় জনান্তিকে।... তা যদি বা হল, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমনে যদি বা এরূপ বোধ কাজও করে, কিন্তু দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক

দল ও বৃহৎ সংগঠনগুলির বর্তমান ভূমিকা এমন ঋণাত্মক কেন? অসংগঠিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ও সক্রিয়তায় সঞ্জীবিত করা যাদের ঘোষিত আদর্শ, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সব গণশক্তিনির্ভর দলগুলির, বিশেষত বামপার্টিগুলির, শামুক-বদ্ধ স্থবিরতা দেখে কিছু অপ্রীতিকর প্রশ্ন স্বতঃই উঠে আসে— একি নির্ধারিত পার্টি লাইনের যন্ত্রকঠিন ফল যেখানে সবার আগে শাসন ক্ষমতা (এবং বৃহৎ গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষা) সবার শেষে জনস্বার্থ? নাকি বর্তমানের নিষ্প্রভ জনমানসে প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণার ইস্যুগুলি নিয়ে কাজে নামার অনীহা বা অক্ষমতা? এরকম সংশয় মনে আসে কারণ এখনকার প্রথাবদ্ধ 'গণমুখী' রাজনৈতিক দলগুলির তালিকায় আমরা প্রত্যক্ষভাবে গণচেতনামূলক, আপাতভাবে অরাজনৈতিক, রোজকার জীবন-ছোঁয়া বিষয়গুলোকে স্থান পেতে দেখি না। যেমন, নারীমুক্তি, জনস্বাস্থ্য, ওষুধ, কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যাধি, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ— এগুলি যেন কোনও আন্দোলনের ইস্যু হতে পারে না, এসব যেন একজন নাগরিকের একান্ত নিজস্ব দায়।

অতএব বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষের সামনে শীতল কুয়াশা এসে যায়। প্রয়োজন দেখা দেয় অন্য আশ্রয়, অন্য প্রথায় প্রতিকারের সম্ভাবনার খোঁজের।... অন্যদিকে গতিশীল বিশ্ব কিন্তু নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব রচনা করে চলেছে, খুলতে চাইছে হতাশাবদ্ধ মানুষের নিমীলিত চোখ। সে নবারুণের সব আলো আমাদের কাছে পৌঁছয় না উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবে। একজন সাধারণ নাগরিক বা ক্রেতা হিসেবে আপন চেতনার বিকাশে একক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক প্রয়াস থেকে বৃহত্তর সম্মিলিত সক্রিয়তায় উত্তরণের সম্ভাবনার কথা আজ উচ্চারিত হচ্ছে। এই সব নতুন তথ্য-সংবাদ সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ মাধ্যম আমাদের কাছে বিশেষ এনে দেয় না, বরং কিছু ছোট গণবিজ্ঞান-গণসংস্কৃতি সংস্থা ও পত্রপত্রিকা এই প্রয়োজনীয় দায়িত্বটুকু পালন করতে চায় আপন ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে সম্বল করে। তাদের থেকেই আমরা জানতে পারছি ইউরোপের নবীন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত 'গ্রিন মুভমেন্ট'-এর কথা। আগমার্কা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্যে ডুবে না থেকে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক সমস্যাগুলোকে 'ইস্যু' হিসেবে ধরা এবং আন্দোলনের সামিল করার এক সাংগঠনিক আশ্রয় 'গ্রিন পার্টি'। পশ্চিম জার্মানিতে এর দানা বেঁধে ওঠার বয়স মাত্র এক-দেড় দশক। এই সংগঠনের নীতি, কর্মপদ্ধতি ও দর্শন নিশ্চয়ই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কোনও ফর্মুলাকে হাত পেতে গ্রহণ করারও প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই সবুজ আন্দোলন যে সর্বস্তরের মানুষের মন ছুঁয়েছে, এনে দিয়েছে এক মুক্ত প্রাণবন্ত স্বপ্নের সম্ভাবনা— তাতে কোনও ভ্রান্তি নেই।

তবু নির্লজ্জ নিন্দুক বিরত হয় না। আবারও উঁকি দিয়ে বলে— 'এ তো বিদেশী দর্শনের আমদানি হল। এদেশের সুযোগ-সম্ভাবনা কই? দেশীয় আইন-কানুনের দুয়ার আঁটা থাকলে করব কী?'

না, পরিস্থিতিটা তত অন্ধকারময় নয়। আসলে এখানেও সেই তথ্য জানার ঘাটতি। বরং বলা ভাল আমাদের জানার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতেও ভালমত জানি না আমরা। একথা সত্যি এদেশে ক্রেতা স্বার্থ-রক্ষা আইন ছিল, আছে গন্ডা কয়েক। কিন্তু তার একটাতেও যে কাজের কাজ হয় না, ক্রেতাকে যে শুধুই 'বোবা' হয়ে থাকতে হয়, বর্তমান ভেজাল কালচারের অবাধ স্রোতই তার প্রমাণ। সম্প্রতি নড়ে চড়ে ফুঁসে ওঠার একটা বড় সুযোগ মিলেছে। গতবছর ক্রেতা-স্বার্থ-রক্ষা বিল (কনজিউমার প্রোটেকশন বিল) আইন হিসেবে বলবৎ হয়েছে এদেশে (যদিও কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রায় নিঃশব্দে পাশ হল আইনটি)। এই বিলের বাড়তি সুবিধা হল একজন ক্রেতা তাঁর কিনে আনা পণ্যে ভেজাল বা নিম্নমানের কিছু খুঁজে পেলে সরাসরি বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে আদালতে অভিযুক্ত করতে পারেন, শাস্তি ও বড় ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। এর জন্য তাঁকে কোনও বড় প্রতিষ্ঠান বা সরকারি বদান্যতার ছত্রছায়ায় যেতে হবে না— নিজে লড়াই করার এই আইনি অধিকার আগে ছিল না।... কিন্তু এই শক্তিশালী আইনের সুবিধাটুকু পেতে গেলে আগে দরকার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা। দরকার তথ্যগত অজ্ঞতা ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতার ব্যাধি কাটানো। ইউরোপ-আমেরিকাতে ক্রেতা-স্বার্থ আন্দোলন এক দারুণ শক্তিশালী রূপ পেয়েছে। তারা শুধু খাদ্যদ্রব্যই নয়, নানান পণ্য ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণেও সরকারি ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছে। এমনকি তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনের মতো ছোট ছোট দেশও ক্রেতাস্বার্থ রক্ষায় প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে। তাহলে আমরা কেন নির্বিকার? এখানকার আধুনিক কিছু শহরে দু'চারটে ক্রেতা সমিতি রয়েছে বটে কিন্তু সে সবই শৌখিন অভিজাতদের ঠাণ্ডাঘরের অবসর বিনোদন। আর যাঁরা আমূল সমাজ-পরিবর্তনের জন্য 'প্রতীক্ষার ঘরে' বসে গাত্রে ছত্রাক জন্মাতে দিচ্ছেন তাঁদেরও বোঝা প্রয়োজন যে, সংঘবদ্ধ ক্রেতা-স্বার্থ আন্দোলন কার্যত সমাজের শেকড়ে আঁচড় কাটার এক শক্তিশালী বুনিয়াদি প্রক্রিয়া, সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবেই একে দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই নব-আন্দোলনের উৎসমুখ হল ব্যক্তিমানুষের অন্দরমহল, সেখান থেকে চেতনার সম্মিলিত বিকাশে বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। তবে সে সম্ভাবনাও বিনষ্ট হবে যদি আমরা নিজের হাতে নিজেদের আত্মকেন্দ্রিক নির্লিপ্ততাকে ভাঙার প্রয়াস না রাখি, যদি সেখানেও ভেজাল থাকে।

আনন্দবাজার ১৪ আগস্ট ১৯৮৮

উমা

একনজরে নরেন্দ্র দভোলকর

শুরুর দিকের জীবন

অচ্যুত ও তারাবাইয়ের দশম ও কনিষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্র দভোলকরের জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯৪৫। বড় ভাই ছিলেন প্রয়াত শিক্ষাব্রতী, *গান্ধীবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী দেবদত্ত দভোলকর*। নরেন্দ্র পড়াশোনা করেছেন *সাতারা*-র নিউ ইংলিশ স্কুল আর *সাংলি*-র উইলিংডন কলেজে। তিনি ছিলেন একজন রীতিমত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক। এম বি বি এস ডিগ্রি পেয়েছেন মীরজ মেডিকাল কলেজ থেকে। বিয়ে হয়েছিল শৈলার সঙ্গে। তাঁদের দুই সন্তান, হামিদ ও মুক্তা দভোলকর।

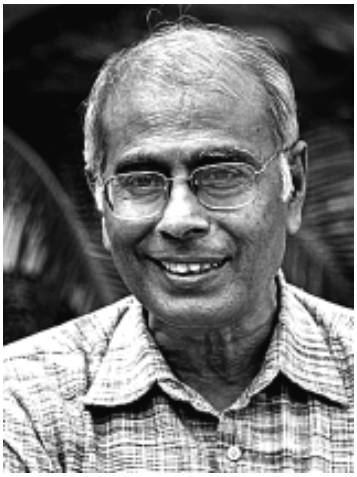

তিনি ছিলেন *শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাবাডি দলের* অধিনায়ক। একটি আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কাবাডি খেলায় দক্ষতার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের শিব ছত্রপতি যুব সম্মান-পুরস্কার অর্জন করেছেন তিনি।

সক্রিয়তাবাদ [Activism]

বারো বছর ডাক্তারি করার পর আশির দশকে দভোলকর হয়ে উঠলেন একজন সমাজকর্মী। বাবা আধাওআর এক গ্রাম— এক কূপ আন্দোলনের মতো একাধিক *সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য* আন্দোলনে জড়িয়ে গেলেন তিনি। ক্রমে ক্রমে দভোলকর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে শুরু করলেন কুসংস্কার নির্মূল করার কাজে। তিনি যোগ দিলেন অখিল ভারতীয় অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতিতে (ABANS)। ১৯৮৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন (Committee for Eradication of Superstition in Maharashtra) আর নেমে পড়লেন কুসংস্কারবিরোধী প্রচারাভিযানে; রুখে দাঁড়ালেন সন্দেহজনক *তান্ত্রিকদের* আর তথাকথিত ধর্মাত্মাদের বিরুদ্ধে, যাঁরা বিভিন্ন রোগের 'অলৌকিক আশ্চর্য নিরাময়ের' অঙ্গীকার করতেন। তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন 'ঈশ্বর-মানবদের', অসংখ্য শিষ্য ভক্ত অনুগামী সমন্বিত সেই সব স্বঘোষিত হিন্দু তপস্বীদের যাঁরা অঘটন ঘটাবার দাবি করতেন। তিনি ছিলেন সাতারায় অবস্থিত *পরিবর্তন* নামে এক সুস্থতা পুনরুদ্ধার কেন্দ্রের (rehabilitation centre) প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। অগ্রগণ্য ভারতীয় যুক্তিবাদী *সনল এডামারুকুর* (Sanal Edamaruku) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। *সানে গুরুজী* (Sane Guruji) প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মারাঠী সাপ্তাহিক *সাধনার* সম্পাদক ছিলেন দভোলকর। এর আগে তিনি ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির সম্মিলনের (Federation of Indian Rationalist Association) সহ-সভাপতির পদেও কাজ করেছেন।

১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দভোলকর মহারাষ্ট্রে *দলিতদের* সমান অধিকারের পক্ষে, *বর্ণের ও জাতপাতের বৈষম্যের* বিরুদ্ধে এবং *মারাঠওয়ারা* বিশ্ববিদ্যালয়কে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামাঙ্কিত করার দাবিতে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। কুসংস্কার বা অন্ধশ্রদ্ধা ও তার নির্মূলনের বিষয়ে তিনি একাধিক বই লিখেছেন এবং তিন হাজারেরও বেশি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। ২০১৩র মার্চ মাসে নাগপুরে হোলি উৎসবের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লড়াই করেছিলেন [আর এক ঈশ্বর-মানব, অনুবাদকের সংযোজন] *আসারাম বাপুর* বিরুদ্ধে। সেবার বাপু ও তাঁর অনুগামীরা আনন্দোৎসব পালনের জন্য নাগপুর পৌরসভার ট্যাঙ্কার থেকে আনা ৫০০০ লিটরেরও বেশি পানীয় জল অপচয় করেছিলেন, তাও এমনই সময় যখন সারা মহারাষ্ট্র খরার সম্মুখীন।

কুসংস্কারবিরোধী এবং যাদুটোনা বিরোধী বিল

২০১০ সালে দভোলকর মহারাষ্ট্রে একটি কুসংস্কারবিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন— তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এম এ এন এস (মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি) *যাদুটোনা বিরোধী বিলের* (Anti Black Magic Bill) খসড়া প্রস্তুত করে। সব রকমের *হিন্দু উগ্রবাদী* সংস্থা এবং *ওআরকারি* (Warkari) গোষ্ঠী এই খসড়া বিলটির বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। *ভারতীয় জনতা পার্টি* এবং *শিবসেনার* মতো রাজনৈতিক দল বিলটি হিন্দু সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে এমন দাবি করে বিলটির বিরোধিতা করল। সমালোচকেরা অভিযোগ করলেন— তিনি ধর্মবিরোধী; কিন্তু ফরাসি প্রেস এজেন্সির (Agence France

Presse) সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ বিলটির কোথাও ঈশ্বর বা ধর্মের বিরুদ্ধে একটি শব্দও নেই। ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। ভারতের সংবিধানে পূজা করবার স্বাধীনতার অনুমোদন আছে এবং কেউ সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে না। এই বিলটির লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে প্রতারণা এবং নিজেদের স্বার্থে মানুষের বিশ্বাসের অপব্যবহারের উদ্দেশ্যে হীন আচরণ।'

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগেও দভোলকর অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্য বিধানসভার সাতটি অধিবেশনে বিলটি আলোচ্য বিষয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও মোটেই আলোচিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চহ্বনের বিরুদ্ধে দভোলকর অভিযোগ করেন, তিনি প্রগতিশীল চিন্তার গতি রুদ্ধ করছেন। দভোলকরের হত্যার পরদিনই মহারাষ্ট্র যাদুটোনা ও কুসংস্কারবিরোধী অর্ডিনান্সটি মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। কিন্তু এই বিলটি আইনে পরিণত হবার আগে পার্লামেন্টে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

হত্যা

যদি আমাকে আমার নিজের দেশে আপন মানুষদের কাছ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পুলিসের সুরক্ষা নিতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে কিছু একটা ঠিকমতো কাজ করছে না। ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকেই চলে আমার সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রাম কারও বিপক্ষে নয়, বরং বলা যায় প্রত্যেকের পক্ষে। —দভোলকর। (পুলিস সুরক্ষা প্রত্যাখ্যানের পর)

গত ২০ অগস্ট ২০১৩, যখন দভোলকর সকালের ভ্রমণের জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়েছেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে দুই বন্দুকধারী, যাদের এখনও সনাক্ত করা যায়নি। ঘটনাটি ঘটে পুনের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছে সকাল ৭টা ২০ ভারতীয় মানক সময় (Indian Standard Time)। আততায়ীরা তাঁর উপর একেবারে সামনে থেকে ৪ রাউন্ড গুলি চালায় এবং কাছেই দাঁড় করিয়ে রাখা মোটর সাইকেল চড়ে পালিয়ে যায়। দুটি বুলেট দভোলকরের মাথায় ও বুকে লাগে। *সাসুন হাসপাতালে* (Sassoon Hospital) আহত অবস্থায় যখন তাঁর চিকিৎসা চলছিল, তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৯৮৩ সাল থেকেই তাঁকে অনেক হুমকি ও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি পুলিস সুরক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

দভোলকরের হত্যাকে ধিক্কার জানিয়েছেন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজকর্মীরা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চহ্বন যে কোন লোক আততায়ীদের সম্বন্ধে খবর জানালে ১০ লক্ষ টাকা (১৬ হাজার ইউ এস ডলার) পুরস্কার পাবেন, এই ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ২১ অগস্ট বন্ধ (ধর্মঘট) ঘোষণা করেছে। দাভোলকরের হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ ছিল। শ্রী চহ্বন জানিয়েছেন পুলিস তাঁর হত্যা সম্বন্ধে কিছু সূত্রের সন্ধান পেয়েছে।

ভাষান্তর: প্রতুল মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্র দভোলকর প্রস্তাবিত খসড়া

কুসংস্কারবিরোধী আইনের পূর্ণপাঠ

মঙ্গলবার অগস্ট ২০, ২০১৩

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যোদ্ধা নরেন্দ্র দভোলকর গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। পুনের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছে দুই যুবক গুলি চালিয়ে হত্যা করল তাঁকে। দেশের নাগরিকদের পক্ষে ক্ষতিকর অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রণয়নের দাবিতে অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূল সমিতির (ANS) দীর্ঘকাল ধরে কঠোর শ্রমসাধ্য আন্দোলন ও প্রচার অভিযানের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী সুশীলকুমার শিণ্ডের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদের সভায় গৃহীত হয়েছে এবং সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মানবসভ্যতার বেড়ে ওঠার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দরকার হল গ্রহণীয় থেকে আরও গ্রহণীয় বিধিবিধানের। মাঝে মাঝেই দরকারমত চালু আইনকানুনেরও রদবদলের ব্যবস্থা করতে হয়।

এই বিশ্বের যেখানটায় আমরা আছি, সেখানে বর্তমান সমাজের একটি বড় অংশের মানুষদের প্রয়োজন এমন সব উপযুক্ত আইন যেগুলি তাদের রক্ষা করতে পারে সেই সমাজেরই কিছু লোকের থেকে যারা তাদের ঠকাবার ও ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে ভুল তথ্যের প্রয়োগ করে এবং তাদের বিপথে চালিত করে।

আরও সঠিকভাবে বলা যায়, সমাজের অশিক্ষিত ও শিক্ষিত স্তরের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস। এটাও সত্যি, এমন

অনেক মানুষ আছে যাদের মুখ্য জীবিকাই হল এই সব অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করা।

সমাজকে আরও সভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন করে তুলতে এই অবস্থাকে চলতে দেওয়া যায় না। তাই সমাজের বিবেকহীন, নীতিবোধহীন অংশের কবল থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার উপযোগী আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আইনের প্রয়োজনীয়তা

যে প্রশ্ন সবসময়ই সামনে রাখা হয়, তা হল, শুধু আইনকানুন জারি করেই কি সমাজ বদলানো যায়? পণপ্রথার বা মদ্যপানের নিষেধক আইনগুলির ব্যর্থতার নজির দেখিয়ে প্রমাণ করা হয় আইন প্রবর্তনে সমাজের পরিবর্তন হয় না। তবে কথাটি পুরোপুরি সত্যি নয়।

যদি মেনেই নেওয়া হয়, শুধু আইন বিধিবদ্ধ করে সমাজকে বদলাতে বাধ্য করা যায় না, সতীদাহ এবং এই ধরনের কয়েকটি অসভ্য প্রথার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন অতীতেও অভদ্র কর্মকাণ্ড বর্জনে সমাজকে সাহায্য করেছে।

এ বিষয়ে আরও বলা যায়, যদি কোন অবাঞ্ছিত বিশ্বাস-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজে একটি সক্রিয় আন্দোলন চলতে থাকে এবং সমাজের একটি বড় অংশ অনিষ্টকর অন্ধবিশ্বাসকে নির্মূল করবার কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করে, তখন এমন একটি আইনের প্রবর্তন অবশ্যই এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করে তুলবে। শুধু তাই নয়, জনসাধারণ, সমাজসংস্কারক এবং সমাজের হিতকামী মানুষেরা সমাজের স্বার্থে এই ইচ্ছাই পোষণ করবেন যেন তাঁদের প্রতিনিধিরা এমন একটি বিধানকে যত শীঘ্র সম্ভব আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন।

খসড়া বিল

এই খসড়া আইনের অভিনবত্ব হচ্ছে এই যে আইনটিকে 'বিশ্বাস' ও 'অন্ধবিশ্বাস' এই দুই শব্দের সংজ্ঞানিরূপণের যুক্তিজালের ফাঁদে আটকে পড়তে হয় না। তাই এখনকার মতো যে সব কর্মকাণ্ড বা প্রথাকে অন্ধবিশ্বাস বলে বিবেচনা করা হচ্ছে সেগুলিই একটি আলাদা তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে তালিকাটির আধুনিক রূপ দেওয়া যেতে পারে।

এভাবেই এই আইনটিকে বিধিবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা পেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এই তালিকাটিকে সত্যিই প্রায়-পূর্ণাঙ্গ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে সাধারণভাবে প্রচলিত সব কটি কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসই স্থান পেয়েছে।

তালিকার অন্তর্ভুক্ত অন্ধবিশ্বাস/কুসংস্কার

কার্ণী, ভানমতী (ভানুমতী) কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন;

অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তির নামে যাদু-কৃত্য প্রদর্শন;

অশুভ আত্মা বা ভূত-প্রেত বিতাড়নের উদ্দেশে বিভূতি (ছাই), কবচ, মন্ত্রপূত তাগা-তাবিজ ইত্যাদি দেবার প্রস্তাব;

নিজেকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে দাবি করা এবং সেই দাবির পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচার;

নিজেকে আগেকার সাধুসন্ত/দেবদেবীর অবতার বলে দাবি করে তাদের মান-মর্যাদা-হানি এবং এইভাবে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায় এমন ধর্মভীরু অতি সরল মানুষদের প্রতারিত করা;

দৈবশক্তি বা অশুভ শক্তি নিজের দেহে ভর করেছে, এমন দাবি করে আশ্চর্য ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শন;

মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর দেহে অশুভ শক্তি ভর করেছে, এমন দাবি করে তার শাস্তিবিধান এবং তার উপর নির্যাতন চালানো;

অঘোরী আচার অনুষ্ঠান;

ক্ষতিকর কাজে ব্যবহৃত শয়তানি যাদুর বা যাদু টোনার (black magic) প্রদর্শন করে সমাজে আতঙ্ক ছড়ানো;

পুত্রসন্তান লাভের জন্য 'গোপাল সন্তান বিধি'র অনুষ্ঠান;

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার বিরোধিতা এবং জোর জবরদস্তি করে অঘোরী মতে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য করা;

তথাকথিত যাদু-পাথর, তাবিজ, বালা বা চূড়, মন্ত্রপূত তাগা, মাদুলি বা সেই ধরনের বস্তু বিক্রি করা বা সেই সব বস্তুর ব্যবসা করা;

অতিপ্রাকৃত শত্তিতেঅ াষ্টিহদওয়া এবং সেইমানসিকঅবস্থাষ্ফূদ্দ ০ঙ০২৯২৫১৩ঙ্টত্ব প্রতিনিষেধক;

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক 'ঈশ্বর-পত্র': ১৯৫৪

মূল রচনা: Albert Einstein's Historic 1954 "God Letter" লেখক - D (ডি)

ধর্মবিশ্বাসীরা যখন আইনস্টাইনকে তাঁদেরই একজন বলে দাবি করেন, তখন কিন্তু তাঁদের পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায়না। আইনস্টাইন যদিও একটু দায়িত্ববোধহীনভাবেই 'ঈশ্বর' শব্দটি কাব্যিক রূপক হিসেবে উদ্ধৃত করতে ভালবাসতেন খুব, তবে আইনস্টাইনের পক্ষে বলতেই হয় খনি থেকে খনিজ তোলার মতো অসৎ উদ্দেশ্যে বক্তৃতা বা লেখা থেকে উদ্ধৃতি তোলার ব্যাপকতা তিনি আদৌ আঁচ করে উঠতে পারেন নি। তাই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা এই চিঠিটি দেখে নেওয়া ভাল। এই চিঠিটিরই 'আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন', এই বিপুল আগ্রহ জাগানো কল্পকথাটিকে (myth) একবার এবং শেষবারের মতো সমাধিস্থ করার কথা। অন্যান্য নানা সূত্রের সঙ্গে এই চিঠিটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আইনস্টাইন ছিলেন, শব্দটির সমস্ত বাস্তবানুগ দ্যোতনায়, একজন নিরীশ্বরবাদী। চিঠিটি যখন ২০০৮ সালে লন্ডনে নিলামে উঠল, আমি তখন রিচার্ড ডকিন্‌স্ ফাউন্ডেশনকে উপহার দেবার জন্য চিঠিটি কিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। আমি যা দেবার প্রস্তাব করতে পেরেছিলাম, তা চূড়ান্ত দামের এক অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র; এবং সেই চূড়ান্ত দামও ছিল এখন যা ন্যূনতম দাম ধার্য হয়েছে সেই তিন মিলিয়ন ডলারের [এক ডলার= ৬০ টাকা ধরলে ১৮ কোটি টাকা] থেকে অনেক কম। আমি আশা করি, যিনিই এই নিলামে জিতুন, তিনি যেন এটি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। এটি যেন ইংরেজি বা অন্য ভাষায় অনূদিত রূপ সমেত সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়।

এই ব্যক্তিগত গোপন চিঠিটিতে আধুনিক সময়ে যে সব মনের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে একটি মনের ঈশ্বর, ধর্ম ও কৌমসত্তার (tribalism) সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হয়েছে, যা কখনই সর্বসাধারণের গ্রহণের জন্য ছিল না।

এই দীপ্তসমুজ্জ্বল মনের অবিবাচিত (uncensored) মতের নাগাল খুব কম মানুষই পেয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত। চিঠিটির এই ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জীবনে এই চিঠিটির জন্মক্ষণ চিঠিটি যে কতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে লেখা হয়েছে তারই আভাস দেয়। তাঁর হস্তলিপির বা পাঠের (script) মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ

এবং তাঁর শব্দচয়নের সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খল (methodical) প্রকৃতি এই দলিলটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ব্যক্ত ধারণাগুলি অস্তিত্বের প্রধানতম প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানে মগ্ন সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ। উত্তরের সন্ধানীদের জন্য যদি কোন নির্দেশগ্রন্থ পাওয়া যেত, তবে এই চিঠিটিই হত তার ভূমিকা।

নিলাম ডাকা হচ্ছে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেটার হেডে নিজের হাতে জার্মান ভাষায় লেখা মূল চিঠি এবং খামের জন্য। চিঠিটি লেখা হয়েছিল ৩ জানুয়ারি ১৯৫৪, আইনস্টাইনের জীবনাবসানের এক বছর আগে এরিখ বি গুটকাইণ্ডকে, গুটকাইণ্ডের লেখা, 'জীবন বেছে নাও, বিদ্রোহের বাইবেলীয় আহ্বান' (Choose Life: The Biblical Call to Revolt) বইটির পাঠপ্রতিক্রিয়া জানাতে।

মুখ্য রচনাংশ

... শেষ কদিন আপনার বইয়ের অনেকখানি পড়ে ফেললাম, বইটি পাঠানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বইটিকে ঘিরে যে ভাবনাটি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গেল তা হল এই — জীবন ও মানবসমাজ সম্পর্কে তথ্যানুগ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের মধ্যে বেশ ভালই মিল রয়েছে।

... ঈশ্বর শব্দটি আমার কাছে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ও ফলস্বরূপ, এর চেয়ে বেশি কিছুই নয়। বাইবেল হচ্ছে আদরণীয় কিন্তু আদিম বেশ কিছু উপকথার সঙ্কলন; তবে সেগুলি প্রায়

শিশুপাঠ্য মনে হয়। যতই এগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটিত হোক এবং তা যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যময় হোক, তাতে আমার ধারণা বদলাবে না। আর এই সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত অর্থপ্রকাশ উপকথাগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী নানান রকমের আর সেগুলির সঙ্গে মূলপাঠের কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আমার কাছে ইহুদি ধর্ম আর সব ধর্মের মতোই সবচেয়ে শিশুসুলভ অন্ধবিশ্বাসের অবতার। এবং আমি যাদের একজন এবং যাদের মানসিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই গভীর, সেই ইহুদি জনগণও যে অন্য সব গোষ্ঠীর থেকে আলাদা কোন গুণের অধিকারী— তা আমার মনে হয়না। আমার অভিজ্ঞতা যতদূর, তার ভিত্তিতে মনে হয় না তারা অন্য মানবগোষ্ঠীর থেকে কোন অংশে মহত্তর, যদিও ক্ষমতার অভাব তাদের সব চেয়ে খারাপ ক্যান্সার থেকে রক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে আমি 'অনেকের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া' তেমন কিছু দেখতে পাই না।

আমি কষ্ট পাই একথা ভেবে যে সাধারণভাবে আপনি নিজেকে যেন এক বিশেষ সুবিধাভোগী বলে দাবি করেন এবং সেই দাবিকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেন দুটি দেওয়াল দিয়ে, একটি বাইরের দেওয়াল, মানুষ হিসেবে। আর একটি ভিতরের দেওয়াল, ইহুদি হিসেবে। মানুষ হিসেবে আপনি অন্যভাবে গৃহীত কারণকার্যসম্বন্ধ থেকে যেন অব্যাহতি দাবি করেন, আবার ইহুদি হিসেবে আপনি একেশ্বরবাদের সুবিধা দাবি করেন। কিন্তু সীমিত কারণকার্য সম্বন্ধ আর কারণকার্য সম্বন্ধ থাকে না, যে কথা আমাদের আশ্চর্য প্রতিভা স্পিনোজা বুঝতে পেরেছিলেন সব রকম কাটাছেঁড়ার পর, সম্ভবত প্রথম মানুষ হিসেবে। এবং প্রকৃতির ধর্মের সর্বপ্রাণবাদী (animistic) ব্যাখ্যা মূল নীতিগতভাবে একচেটিয়াকরণ (monopolization) দিয়ে খারিজ করা যায় না। এই ধরনের দেওয়ালের সাহায্যে আমরা যা অর্জন করি, তা এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। সে দেওয়াল আমাদের নৈতিক প্রয়াসের অগ্রগতির সহায়ক নয়। বরং উল্টোটাই সত্যি।

এই মুহূর্তে যখন আমি বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পার্থক্যটি খোলাখুলি তুলে ধরলাম, তখনও কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে মৌলিক বিষয়গুলিতে অর্থাৎ মানুষের আচরণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান বেশ কাছাকাছি। যা আমাদের আলাদা করে রেখেছে তা হল, ফ্রয়েডের ভাষায় বৌদ্ধিক 'ঠেকনো' (props) আর যৌক্তিকীকরণ (rationalization)। সুতরাং আমার মনে হয় আমরা পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই বুঝে নিতে পারব যদি আমরা বাস্তব জিনিসগুলির বিষয়ে কথা বলি।

বন্ধুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ ও শুভকামনাসহ

আপনার

এ. আইনস্টাইন

উপরের অনুবাদটি [ইংরেজি অনুবাদের কথা বলা হয়েছে] প্রিন্সটন থেকে ৪ জানুয়ারি, ১৯৫৪ তারিখে এরিখ গুটকাইণ্ডকে লেখা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের চিঠির সংক্ষিপ্ত রূপ। জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন জোন স্ট্যামবাভ (Joan Stambaugh)

কেনার পর থেকে চিঠিটি রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসম্পন্ন বস্তুর সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠানে। জিনিসটি রয়েছে একটি বিশেষ তাপমাত্রায়, আর্দ্রতায় ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। এই চিঠিটির প্রামাণিকতা নিয়ে কখনও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। বিজ্ঞানী সমাজে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে চিঠিটি সুপরিজ্ঞাত। এর সত্যতার আরও প্রমাণ মেলে আসল খাম, ডাকটিকেট এবং ডাকঘরের ছাপে (post mark)। নিলাম শুরু হবে প্রথম ডাক তিন মিলিয়ন ইউ এস ডলারে।

ভাষান্তর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

উমা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম সভাকক্ষ

১৭ নভেম্বর, ২০১৩, রবিবার

বিকেল সাড়ে পাঁচটায়

বিষয়— **চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য: আমরা কী ভাবছি**

বক্তা: **সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়**

ফ্যাশিবাদের ছাঁটাই

ড. নরেন্দ্র দভোলকর

মূল রচনা: Downsizing Fascism, **ভাষান্তর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়**

জলাগাও ডিস্ট্রিক রোটারি ক্লাব আমার বক্তৃতার আয়োজন করেছিল ৪ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে। রোটারি ক্লাব ছাড়াও জলাগাও ও ভুসাওয়ালের আরও কয়েকটি কলেজ তাদের নিজের নিজের কলেজভবনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিল। সব জায়গাতেই পুরোদমে প্রস্তুতি চলছিল। আমি তখন ট্রেনে পুনে থেকে জলাগাওয়ের পথে। হঠাৎই রাত ৯টায় আমার সেলফোন বেজে উঠল। কলটি এসেছে জলাগাও থেকেই। জানা গেল জলাগাও পুলিস আমার বক্তৃতা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের সাবধান করে দিয়েছেন, আদেশ পালন না করলে তাঁদের শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যবস্থাপকেরা বললেন, বক্তৃতার বিষয়ে বিশদ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সংস্থা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা আবেদন করে জানায় ড. দভোলকরকে কিছুতেই বক্তৃতা দিতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তিনি ভাষণে হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে এমন কঠোর কটূক্তি করেন, যাতে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে। যদি ড. দভোলকর 'আমাদের' পবিত্র দেবদেবীদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন, তাহলে পুলিসকেই কিন্তু যে কোন রকমের অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী বলে গণ্য করা হবে। এর আগে এই ফ্যাশিবাদী সংগঠনগুলি এই সব ব্যবস্থাপকদের সাবধান করে তাদের অসন্তোষের কথা জানাত আর অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য চাপ দিত। এবার তারা এক কদম এগিয়ে একই কাজের জন্য চাপ দিচ্ছে পুলিসের উপর। রোটারি ক্লাব থেকে পুলিসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হল। কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধেও পুলিসের অনুমতি পাওয়া গেল না।

দুটি ফোন নম্বর ছিল আমার সেল ফোনের পর্দায়। একটি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আর পাতিলের, আর একটি জলগাঁও জেলার পুলিস কমিশনারের। দুটি নম্বরেরই একবার এটা একবার ওটা চেষ্টা করতে করতে জলগাঁও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হল। ডি এস পির সঙ্গে আমার কথাবার্তার সারাংশ এরকম:

ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা অনুমোদন করেছে। পুলিস দপ্তর সেই সংবিধানকে রক্ষা করবে, এটাই তো প্রত্যাশিত! যদি কেউ সংবিধানস্বীকৃত অধিকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পুলিসের কর্তব্য হচ্ছে সেই বাধা দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। অথচ এ ক্ষেত্রে পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গি দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব তাঁদের এই গুরুতর ভুলটি উপলব্ধি করে সেই মতো কাজ করা উচিত।

গত তিরিশ বছর বা তার কিছু বেশি সময় ধরে আমি বোধ হয় হাজারেরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছি, শত শত প্রবন্ধ লিখেছি। এ ছাড়াও আমি পনেররও বেশি বই লিখেছি, তার মধ্যে কয়েকটি সরকার থেকে পুরস্কার অর্জন করেছে। আমার বলা বা লেখা শব্দের জন্য আমি একবারও দোষী সাব্যস্ত হইনি।

আমার বক্তৃতার মধ্যে, লেখার মধ্যে এবং আমার সংগঠনের মাধ্যমে, সব সময়ই আমি যে দুটি মূল ভাবনার প্রচার করি তা হল বিজ্ঞানমনস্কতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতা। দুটি ভাবনারই উল্লেখ আছে সংবিধানে। আসলে যাঁরা আমার বক্তৃতার বিরোধিতা করছেন, তাঁদের অবস্থান সংবিধানবিরোধী।

পুলিস আমার বক্তৃতা-অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে না। আমি জলাগাও আসছি। আমার সংগঠন এর মধ্যে অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমি উদ্যোক্তাদের নিরাশ করতে পারি না। ইচ্ছে করলে আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমি আপনাদের থানার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করব যতক্ষণ না আপনারা আমার বক্তৃতা-অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন।

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেহাত ঘটনাক্রমেই হয়ে গেল। নইলে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেই যোগাযোগ করতাম। তাহলে আপনি বক্তৃতা-অনুষ্ঠানের অনুমতি দেবার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করতে বাধ্য হতেন।

এই কথাবার্তা চলছিল দশ মিনিটেরও বেশি। পুলিসদের সাধারণত জনসাধারণের কথা, বিশেষ করে এরকম একতরফা সংলাপ শোনার অভ্যেস নেই। তবু আমার কথা শুনতেই হল ডিএসপি-কে। ডিএসপি জানতে চাইলেন আমি কী নিয়ে বলব।

আমি : সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ডিএসপি : দয়া করে বলুন না ডক্টর, বন্ধু হিসেবেই বলুন।

আমি : আমার বক্তৃতার বিষয় হল, আমার আত্মিক আশঙ্কা (My Spiritual Apprehension) এবং আমি মনে করিনা এর সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর কোন সম্পর্ক আছে।

ডিএসপি : আমি আপনাদের অনুমতি দেব। আমি এটাও

দেখব যাতে আপনার এখানে থাকার সময় কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে।

আমি : ধন্যবাদ।

জলাগাওয়ে ফোনগুলি বাজতে শুরু করল। কাগজে কাগজে খবরের শিরোনাম বদলানো দরকার। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতার শিরোনাম হল— 'ড. দভোলকরের বক্তৃতা মঞ্জুর'। জলাগাও আর ভুসাওয়ালের অনুষ্ঠান সফল হল। সব কাজকর্মই চলল মসৃণভাবে, কোনরকম প্রতিকূল ঘটনা। ছাত্রেরা ও জনসাধারণ মন দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনলেন। আমার সক্রিয়তাবাদী (activist) বন্ধুরা এ এন এস [অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি] প্রকাশিত বইপত্র বিক্রি করে ভালই অর্থসংগ্রহ করে ফেললেন।

আসলে এমন ঘটনা প্রথম নয়, শোলাপুরে একই রকম ঘটনার পর দ্বিতীয়বার ঘটল। তা সত্ত্বেও ফ্যাশিবাদীরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আমি মনে করি তারা কখনোই যুক্তির রাস্তায় হাঁটবে না। তাদের অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় পেলাম জলাগাওয়ের অনুষ্ঠানের পরেই একটি ফোনের জবাব দিতে গিয়ে।

ফোন করেছিলেন মুম্বই থেকে নন্দকিশোর তালাশিকর। তিনি কথা বলছিলেন আন্ধেরি রেলওয়ে থানা থেকে। বললেন, স্বপ্নিল তাওয়ারে নামে এক তরুণ এ এন এস সক্রিয়তাবাদী কুর্লা রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এ এন এস প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকা বিক্রি করছিলেন। যখন তিনি একা ছিলেন, তখন বজরং দল, ভিএইচপি [বিশ্ব হিন্দু পরিষদ], হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, ইত্যাদি নামধারী ৪০-৫০ জনের এক জনতা তাঁকে আক্রমণ করে, প্রকাশিত বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করে। তারপর তাঁকে জোর করে এক অটোতে বসিয়ে কাছেই আন্ধেরি রেলওয়ে থানায় নিয়ে যায়। সেই জনতার নেতা তখন জোর গলায় বলতে থাকে যে স্বপ্নিল একটি বইয়ের মলাটে ছাপা লেবু-গাঁথা একটি বিকৃত ত্রিশূল দেখিয়ে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করেছে এবং সেজন্য তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা উচিত। পুলিসকে দাবি অনুযায়ী কাজ করার জন্য সেই ভিড় থেকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ড. এন ডি পাতিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি আবার পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, 'এ এন এস যে সমস্ত প্রকাশিত বইপত্র বিক্রি করছিল, তার কোনটিকেই মহারাষ্ট্র সরকার বা অন্য কোন সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। কেউ যদি নিষিদ্ধ হয়নি এমন বই বিক্রিতে বাধা দেয়, তাহলে সে কাজ বাক্‌স্বাধীনতাভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। যদি পুলিস নিজের থেকেই একটি মামলা রুজু করে, তাহলে কিন্তু আপনারা বিপদে পড়বেন।' তাঁর কথা শুনে ডিএসপি এ বিষয়ে আর না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি স্বপ্নিলের বিরুদ্ধে এফ আর আই [প্রাথমিক তথ্যের প্রতিবেদন] নথিবদ্ধ করার জন্য জনতার দাবি অগ্রাহ্য করলেন এবং পরের দিন একটি বৈঠকে ব্যাপারটি আলোচনা করার পরামর্শ দিলেন।

এর মধ্যে আমি বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি যোগাযোগ করলেন পুলিসের সঙ্গে। পরের দিন আমরা যখন থানায় তখন পুলিসের আচারব্যবহার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল। তাঁদের কথাবার্তা ছিল ভদ্র, শিষ্টাচারসম্মত। এমন কি তাঁরা আমাদের চা খাওয়ালেন। যে জনতার হাতে স্বপ্নিল আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার থেকে একজনই থানায় এসেছিল। পুলিসের তরফ থেকে তাকে জানানো হল পুলিস এ বিষয়ে আর কোনো কাজ করবে না। ইচ্ছা করলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এগোতে পারেন। বেচারাকে তার দম্ভ চুপচাপ গিলে ফিরে যেতে হল। পুলিস থেকে আমাদের জানানো হল যে তারা এ এন এস প্রকাশিত বইপত্র বিক্রির সময় বিক্রেতাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে যারা ভিড়ের মধ্যে স্বপ্নিলকে আক্রমণ করেছিল, সেই সব দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে তাঁরা রাজি নন। যাই হোক, স্বপ্নিল তাওয়ারে এবং নন্দকিশোর তালাশিকর এরকম একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যে সাহসিকতার উদাহরণ রেখে গেলেন, সেজন্য তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দিতেই হয়।

আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন— এ বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা— সংবিধানের এই দুটি নির্দেশক নীতির প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। সংবিধানে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী আমরা অন্যের ধর্মীয় অনুভবকে সম্মান করি। আসলে আমাদের বিরোধীরা ধর্মীয় হিন্দুরাষ্ট্রের ভাবনার সমর্থক। বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অহিংসা— কিছুতেই তাঁদের বিশ্বাস নেই। তার বদলে তারা নেয় হিংসার, ধ্বংসের আর অসত্য অভিযোগের আশ্রয়। উদ্দেশ্য— তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা। এদের শোধরাবার কোন আশা আছে বলে তো মনে হয় না। তাদের মনোবৃত্তি বা প্রবণতার (attitude) কথা মনে রেখে তাদের আক্রমণ ও রণনীতির মোকাবিলা করবার ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সঞ্চার ব্যবস্থা (Communication), কোনও ঘটনার আইনগত তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞান, সংযোগ-জাল বিন্যাস (networking) ইত্যাদি হওয়া উচিত আধুনিক সময়োপযোগী, যাতে আমাদের ভবিষ্যতে কোন কদর্য পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়। প্রয়োজন হলে প্রত্যেক ইউনিটে (একক) থাকা উচিত একজন নিজস্ব আইনবিশেষজ্ঞ যিনি বিপদের সময় আমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারেন। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এই ফ্যাশিবাদীদের সঙ্গেই, যদিও তাদের সংখ্যার ছাঁটাইয়ের কাজও চলছে। পালাবার পথ নেই।

উমা

বিশ্বাস: কুসংস্কারের উৎস

সমীরকুমার ঘোষ (সুমন ওকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে)

কুসংস্কার তাড়ানোর পুরো আন্দোলনটাই ঘুরপাক খায় বিশ্বাসকে (ফেইথ) ঘিরে। আমাদের দিকে যত ইটপাটকেল ধেয়ে আসে বা ফুলের তোড়া-- সবই এর দৌলতে। অনেকেই আমাদের কাজকর্মকে প্রয়োজনীয়, উপকারী এবং যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। বাকিদের মনোভাব একেবারেই এর উল্টো। কিছু লোকের বক্তব্য, যতক্ষণ না কুসংস্কার পুরোপুরি দূর হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারব না। অপরদিকে বাকিদের বক্তব্য, কুসংস্কার তাড়ানো হল ঈশ্বর, ধর্ম ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করারই একটা ঘুরপথ। ওদের প্রশ্ন, কুসংস্কার বলতে ঠিক কী বোঝায়? এটা অনেকটা জ্বলন্ত কয়লার ওপর থেকে জমে-যাওয়া ছাই উড়িয়ে দেওয়ার মতো। ছাই সরে গেলেই আঁচ আবার গনগনে হয়ে ওঠে। সুতরাং, এই ছাই-রূপ কুসংস্কার উড়িয়ে দেওয়াটা খুবই জরুরি। তবে সেই সঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হয়, তা করতে গিয়ে যেন আগুনটা নিভে না যায়।

বিশ্বাসের আপেক্ষিকতা

কুসংস্কার তাড়ানো নিয়ে এত ধরনের মতামত কেন? কারণ, একজনের কাছে যা বিশ্বাস, অন্যজনের কাছে সেটাই কুসংস্কার। তৃতীয়জন যাকে কুসংস্কার বলে মনে করেন, সেটা আবার জোরালো বিশ্বাস। চতুর্থজনের কাছে ব্যাপারটা জীবন-মরণের প্রশ্নের মতো। ফলে কোনটা বিশ্বাস আর কোনটা কুসংস্কার, সেটা ব্যাখ্যা করাটা খুব জরুরি। কিন্তু এটা করতে গেলে একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কারণটা আমরা আগেই দেখেছি। বিশ্বাস ব্যাপারটা সময় এবং ব্যক্তিবিশেষে বদলে যায়। আমরা সবাই সত্যসাঁইবাবার ছবি দেখেছি। শিষ্যদের কাছে তিনি একজন মস্ত বাবা, গুরু, সাধুপুরুষ। এমনকি ঈশ্বরও! এই বাবার অভিনবত্ব কী? উনি বাতাসে হাত ঘুরিয়ে আপনাকে পূত ভস্ম, সোনার হার, রুপোর আংটি ইত্যাদি কি না দেন! ওঁর বইতে দাবি করা হয়েছে, উনি নাকি ভক্তদের সোনার লকেট ও মণিমুক্ত বসানো হারও দিয়েছেন। এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার দৌলতে উনি অসংখ্য পুরুষ ও নারীর বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিও রয়েছেন। অন্যদিকে, এমন বেশ কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা এই অলৌকিক ঘটনাকে জোচ্চুরি ছাড়া অন্য কিছুই মনে করেন না। তাঁদের কাছে এগুলো কিছু সরল বিশ্বাসী লোকের মধ্যে মূর্তিপূজা ও কুসংস্কার ছড়ানোর চেষ্টা। এগুলোকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আপেক্ষিক বিশ্বাস বলা যেতে পারে।

কুসংস্কার তাড়ানো নিয়ে এত ধরনের মতামত কেন? কারণ, একজনের কাছে যা বিশ্বাস, অন্যজনের কাছে সেটাই কুসংস্কার। তৃতীয়জন যাকে কুসংস্কার বলে মনে করেন, সেটা আবার জোরালো বিশ্বাস। চতুর্থজনের কাছে ব্যাপারটা জীবন-মরণের প্রশ্নের মতো।

বিশ্বাসের অর্থ

বিশ্বাস কথাটার নানারকম অর্থ হয়। এই কথাগুলোকে খেয়াল করুন: আমার বিশ্বাস আছে আমার মায়ের ওপর আর বাবার ওপর; আমার বিশ্বাস আছে আমার গুরু অথবা বাবার ওপর; আমার বিশ্বাস আছে আমার পারিবারিক দেবতা ও ধর্মের ওপর; আমার বিশ্বাস আছে অলৌকিক ঘটনা, অতীন্দ্রিয় শক্তি, আর সেই সঙ্গে মন্ত্রের ক্ষমতার ওপর; আমার বিশ্বাস আছে সাম্যে এবং এই দেশের সংবিধানে। প্রতিটি কথাতেই বিশ্বাস কথাটার অর্থ আলাদা। কিন্তু খুব কম লোকই এ ব্যাপারে সচেতন। আমরা সাধারণত প্রচলিত অর্থটাই গ্রহণ করি। ধরা যাক, আপনি বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছেন, এমন সময় উল্টোদিক থেকে একজন লোককে আসতে দেখা গেল। আপনি বন্ধুকে বললেন, লোকটা অমুক নেতার 'চামচে'। চামচের আক্ষরিক অর্থ চামচ। কিন্তু শব্দটাকে যখন কোনো নির্দিষ্ট লোক সম্পর্কে ব্যবহার করলেন, আপনার বন্ধুর অর্থটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না। একইভাবে বিশ্বাস কথাটা যখন নিত্যদিনের কাজেকর্মে ব্যবহার করা হয়, তার মানে ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্য এক বিশ্বে বিশ্বাস অথবা জন্ম-মৃত্যুর

চক্র থেকে আত্মার মুক্তি। লক্ষ লক্ষ মন্দির থেকে হাজার হাজার পুরোহিত আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এবং একমাত্র এই বিশ্বাসই পারে সঙ্কটময় জীবনসমুদ্র নিরাপদে পেরিয়ে যাত্তয়ায় সাহায্য করতে। ত্তঁরা শেখান, যুক্তি খুঁজতে যেত্ত না। কারণ যুক্তি একজনকে কোথাত্ত নিয়ে যেতে পারে না। যুক্তির বদলে আবে* দ্বারা পরিচালিত হত্ত। তোমার বিবেক বা যুক্তিপূণষ্টবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিত্ত না, দিলে তা তোমার ধমীষ্ট্য পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ত্তঁরা যা শিক্ষা দেন, ত্ত তোমার কাছে চান, তা নিশ্চিতভাবেই কুসংস্কার, বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস ত্ত কুসংস্কার নিয়ে আরত্ত এশেনোর আ* আরেক জোড়া শব্দের কথা বিবেচনা করা যাক।

ভরসা ত্ত বিশ্বাস (ট্রাস্ট অ্যান্ড ফেইথ)

এবার এই বাক্যটা খেয়াল করোঞ্জ আমার ঘরের পাখাটার ত্তপর আমার এই বিশ্বাস আছে, ত্তটা আমাকে ঠাণ্ডা হাত্তয়া দেবে। আমার কলমটার ত্তপর বিশ্বাস আছে, ত্তটা কা*জের ত্তপর চিঠি লিখতে পারে। কথাগুলো কি সত্যি? কেউ বলবে, সত্যি। অন্যরা বলবে, নয়। কারণ পাখা বা কলমের ত্তপর তোমার যত বিশ্বাসই থাক না কেন, তাদের উদ্দেশে তুমি যত প্রাথষ্টনাই করো না কেন, কলমের কালি ফুরিয়ে ে*লে ত্তটা দিয়ে আর লেখা পড়বে না। আর বিদ্যুথ্ম সংযো* বন্ধ করলে পাখাত্ত চলবে না। এই কাযষ্টকারণ সম্পকষ্ট ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, এটা ভরসার ব্যাপার, বিশ্বাসের নয়। একইভাবে কিছু ঘোষণা, যেমন-- দুই আর দুই গুণ করলে চার হয়; ঠিকঠাক টিকে নিলে পোলিত্ত ঠেকানো যায়; শূন্য আবিষ্কার হয়েছিল ভারতবষেষ্ট; শিবাজি একজন মহথ্ম রাজা ছিলেন, জাতীয় কথা সবই ভরসার ব্যাপার। তুমি যদি সমসাময়িক অন্যান্য রাজার জীবনী দেখ, দেখবে শিবাজির মতো কোনো রাজারই উথ্মকষষ্ট ত্ত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণেই আমরা মনে করি তিনি মহান ছিলেন।

আমি এবার অবিশ্বাসের একটা বিপরীত যুক্তি দেখাই। এটা সত্যি ঘটনা। একটি মহিলা তাঁর তিন সন্তান নিয়ে একটি গ্রামে থাকতেন। স্বামী চাকরি করতেন মুম্বইতে। কেউ একজন তাঁকে তাঁর স্ত্রীর চরিত্র সম্পকেষ্ট কানভারী করেছিল। এতে স্বামী ভদ্রলোক প্রচণ্ড রে* যান। গ্রামে ফিরে স্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে তাঁর কাছে সতীত্বের পরীক্ষা চান। বলেন, 'তুমি যদি কলঙ্কহীন হত্ত, তাহলে গ্রামের মন্দিরে রাখা ফুটন্ত তেলের পাত্রের নীচে-থাকা পয়সা তুলে আনবে। তাতে যদি তোমার হাত না পোড়ে, প্রমাণ হবে তুমি সতী। আমি তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেব।' অসহায় সেই মহিলা স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের প্রস্তাবে ভেঙে পড়েন। বুঝতে পারেন না, কী করবেন। ত্তঁর ভাই জানতেন এএনএস (অন্ধশ্রদ্ধা নিমূষ্টলন সমিতি) কমীষ্ট্রা এই ধরনের কৌশল দেখিয়ে থাকে। তিনি এসে আমাদের ধরলেন। আমরা তাঁকে কৌশলটা শিখিয়ে দিলাম। তাঁর দিদি গ্রামভতিষ্ট লোকের সামনে সেই অলৌকিক ঘটনাটি করে দেখিয়ে সে যাত্রা নিজের বিয়েটাকে টেকালেন।

এখানে সেই মহিলার সতীত্ব বা অসতীত্ব এবং *রম তেলে হাত ডোবানোয় তাঁর হাত পুড়ল কি, পুড়ল না, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মোদ্দা কথা, এই দুটো ঘটনার মধ্যে কি কোথাত্ত কোনো মিল আছে? এ দুটোর মধ্যে যে কোনো সম্পকষ্ট নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাযষ্ট-কারণ সম্পকেষ্টর ভিত্তি ছাড়া এ ধরনের তুচ্ছ কল্পনা করাটাই কুসংস্কার। যদিত্ত একজনকে মনে রাখতে হবে, ত্তপরের ঘটনার মতো সন্দেহাতীতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হত্তয়া সবসময় সম্ভব নয়। তবুত্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না সেটা আমাদের আঘাত

করে এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেত্ত আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেই বেশিরভা* লোক সাহায্যের জন্য বিশ্বাসের আশ্রয় নেয়। জিনিসটা আছে, এমন কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেত্ত, যখন কেউ সেটায় বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজকমষ্ট চালিয়ে যেতে থাকে, সেটাই তার কাছে বিশ্বাস।

চিকিশ্মসকের ত্তপর বিশ্বাস

দৈনন্দিন কাজকমেষ্টর ক্ষেত্রে লোকে জানে, তারা কী করছে। এমনকি নিজেদের বিশ্বাসের পরীক্ষাত্ত নেয়। আমরা প্রায়শই বলে থাকি, চিকিশ্মসকের ত্তপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তার মানে, যখনই পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তুমি তাকে পারিবারিক চিকিশ্মসকের কাছে নিয়ে যাত্ত। তিনি যা ত্তষুধ দেন, তাতে রো*ী সেরে ত্তঠে। যেহেতু ব্যাপারটা হামেশাই ঘটে থাকে, চিকিশ্মসকের ত্তপর আমাদের একটা বিশ্বাস তৈরি হয়। যদি এমন হয়, কিছুদিন পরে একটি অসুস্থ শিশুকে তিনি সারিয়ে তুলতে পারলেন না। শিশুটিকে একজন শিশুবিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হল। আরত্ত কয়েক মাস পরে পরিবারের আরেকজনকেত্ত ত্তই চিকিশ্মসক সারিয়ে তুলতে পারলেন না। অসুস্থতা বেড়ে যাত্তয়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। এইভাবে ত্তই চিকিশ্মসকের অধীনে থাকাকালীন রো* যদি বেড়ে যায়, তাহলে কি তুমি তাঁর কাছে চিকিশ্মসা চালিয়ে যাবে? না, তা তুমি করবে না। এক্ষেত্রে তোমার চিকিশ্মসকের ত্তপর বিশ্বাস কোথায় *লে? *ত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ত্তই চিকিশ্মসক আর আ*ের মতো কাযষ্টকর নয়। তাই তুমি অন্য একজন চিকিশ্মসকের কাছে *লে। এই সময়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূণষ্ট ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার ভিত্তিতে তুমি চিকিশ্মসকের যো*্যতা সম্পকেষ্ট তোমার বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে পেরেছ। এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, এরপর আর ত্তই চিকিশ্মসকের কাছে রো*ী নিয়ে যাত্তয়া ঠিক হবে না। যদি ত্তই চিকিশ্মসকের পরের পর ব্যথষ্টতা সত্ত্বেত্ত তুমি তার কাছে যাত্ত, তার মানে কী দাঁড়ায়? বিশ্বাস? কুসংস্কার? এই ঘটনা থেকে যে গুরুত্বপূণষ্ট সিদ্ধান্ত একজন নিতে পারে, তা হল, জ্ঞান এবং/অথবা অভিজ্ঞতা মতো প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেত্ত যদি এই ধরনের ঘটনা থেকে যায়, তাকে বলা যায় বিশ্বাস বা ভরসা। এবং জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রশ্ন করার পর থেমে যায়, তাকে বলা যায় কুসংস্কার। এখানে ঘটনা হল, তোমার শিশুর অসুস্থতা। তোমার অভিজ্ঞতা বলছে, আ* তোমার চিকিশ্মসক শিশুটিকে সারিয়ে তুলতে পেরেছেন। চিকিশ্মসকের কাযষ্টকারিতা আর এখন নেই, এটা হল জ্ঞান। এ থেকে তুমি সিদ্ধান্ত নিলে, চিকিশ্মসক বদলের এটাই ঠিক সময়। এই পুরো ব্যাপারটা একটা প্রক্রিয়া। আমরা ঘটনার মুখোমুখি হই, জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। মানে, বিভিন্ন ঘটনা থেকে জ্ঞান লাভ করি। তারপর ঘটনাগুলোকে জ্ঞান ত্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করি এবং বিশ্বাসের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসি। অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই খুব সরল ঠেকছে। কিন্তু এটা অনুসরণ করা খুবই কঠিন। কারত্ত বিশ্বাস সম্পকেষ্ট সিদ্ধান্ত নেত্তয়া, মানে এটা বিশ্বাস, না কুসংস্কার, সবচেয়ে কঠিন। কারণ এটা আমাদের অহং বোধে আঘাত করে। তাই সকলেই এটা এড়িয়ে যাত্তয়ার চেষ্টা করি। ঠিক এই কারণেই এএনএসের জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাত্তয়াটা খুব দরকার।

বিশ্বাসের অথষ্ট- একটি স্ববিরোধ

এবার আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূণষ্ট বিষয়টার দিকে ফিরব। সেটা হল, 'আমার বিশ্বাস' এবং আমার কাছে বিশ্বাসের মানে কী। একই সঙ্গে আমার বিশ্বাস যদি তোমার মতে কুসংস্কার হয়, সেক্ষেত্রে তোমার কাছে এর অথষ্ট কী। যেহেতু এই দেশে আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তুমি তোমার বিশ্বাস মতো চলতে পারো। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে দুটো সমান গুরুত্বের বিশ্বাস একে অপরের বিরোধিতা করে। যেটা আমাদের দেশে আকচার হয়ে থাকে। কেউ মনে করে, দেশটা হিন্দু রাষ্ট্র হত্তয়া উচিত। উল্টোদিকে আরেক দলের মত, রাষ্ট্রকে কোনো মূল্যেই ধমীষ্টয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেত্তয়া যায় না। এটা ধমষ্টনিরপেক্ষ হত্তয়া উচিত। এএনএস পরেরটার সঙ্গেই সহমত পোষণ করে। সমস্যাটা হল, কীভাবে একজন স্থির করবে, কোনটা বিশ্বাস আর কোনটা কুসংস্কার? এখানে বিশ্বাসের রসায়নের গুরুত্বপূণষ্ট দিকটাকেই আমাদের বিবেচনা করা উচিত। প্রতিটি বিশ্বাসই *ভীরভাবে আবে*ের রঙে মাখানো। একজন মানুষ শুধুমাত্র তার মেধা দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। মেধা এবং একই সঙ্গে আবে*ই হল সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। যেহেতু তার সিদ্ধান্ত আবে*ের রঙে রঙিন, তা থেকেই বিশ্বাস ত্ত কুসংস্কার সমস্যার সৃষ্টি। এটা অখণ্ড এক বিষয় তৈরি করে, যার একদিকে থাকে ভরসা, অন্যদিকে কুসংস্কার, বিশ্বাসটা থাকে মাঝামাঝি। এখন ভরসাকে প্রভাবিত করে চিন্তা, সেখানে আবে*ের কোনো স্থান নেই। কেউ যদি তোমাকে খুব জোরের সঙ্গে বলে যে, দুই আর দুইয়ে চার হয় না, তুমি তাকে মূখষ্ট বলে ভাববে এবং পাত্তা দেবে না। এখানে সে তোমার বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে না। কিন্তু যারা পুত্রসন্তানের জন্য একজন মানুষকে বলি দেয়, এটা পুরোপুরি কুসংস্কার। এখানে ভাবনাচিন্তা বা ত্তই জাতীয় কিছুর কোনো জায়*ই নেই। এটা পুরোপুরি আবে*ের ফাঁসে বাঁধা। তাহলে বিশ্বাসটা কী? বিশ্বাস হল আবে*, যা সত্যের মধ্যে থাকা চিন্তায় বিকাশলাভ করে এবং মূল্যবোধে উদ্ধসাহ দেত্তয়ায় রূপান্তরিত হয়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, মানুষের মেধা আছে, সেই সঙ্গে আছে আবে*ত্ত। তার এই দুটোরই দরকার। একটা রেল*াড়ি শুধুমাত্র

ইঞ্জিনের (তার মানে মেধা) সাহায্যে চলতে পারে না, তার জ্বালানীত্ত (মানে আবে*) দরকার হয়। অনেক সময়েই মানুষকে যুক্তিতক্ষেষ্টর বদলে আবে*র হাতে সিদ্ধান্ত নেত্তয়ার ভার ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু তার মানে ভাবনাচিন্তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেত্তয়া নয়। যুক্তিবজিষ্টত হয়ে আবে*র দ্বারা পরিচালিত হত্তয়ার ঝোঁকই কুসংস্কারে পরিণত হয়। যদিত্ত আবে*র ভিত্তিতে নেত্তয়া সিদ্ধান্তকে যদি যুক্তিতক্ষষ্ট দিয়ে যাচাই করা হয়, তার মানে এটা চিন্তা প্রক্রিয়ারই বিকাশ।

বিশ্বাসের চারটি বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, ঘটনা বা সত্যকে যাচাই করা। যে বিশ্বাস প্রকৃত ঘটনা বা সত্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না, তা কুসংস্কার। এর মানে কী? বাবাসাহেব আম্বেদকার একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বলছেন, 'যদি তুমি একটি হলুদ রঙের উজ্জ্বল ধাতুর টুকরো পাত্ত, তুমি কি সোনা পেয়েছ বলে লাফিয়ে ত্তঠো? না, তুমি নিজের সঙ্গে তকষ্ট করো। তারপর আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা করো। টুকরোটা সোনা হলে ঝকমক করবে। তা যদি না হয়, ত্তটা পেতলের টুকরো। যে মূল্যবোধগুলো তোমায় চালিত করে এবং জীবনকে ধারণ করে থাকে, তাদের বেলাতেত্ত এইভাবে যাচিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না কেন? তোমার মূল্যবোধগুলো সম্পাকেষ্ট অবশ্যই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেত্তয়া উচিত। তার মানে, তোমার বিশ্বাসকে সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় যাচিয়ে নেত্তয়া জরুরি।'

বিশ্বাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অহিংসা। যে কোনো সমাজেই লোকের বিভিন্ন বিশ্বাস থাকে। তাদের অবশ্যই নিজ নিজ বিশ্বাস সম্পাকেষ্ট শিক্ষা দেত্তয়া ত্ত প্রচারের সুযো* দেত্তয়া উচিত, যতক্ষণ তাদের কাজকমষ্ট শোভনতার *ণ্ডির মধ্যে থাকে। নিজের বিশ্বাস যেমন পালন করবে, তেমন অন্যের বিশ্বাসকেত্ত শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। এই হল সহনশীলতা, যা জীবনের মৌলিক নীতি। অহিংসার মূলে আছে এটাই। অন্যের বিশ্বাসের কোনো জায়*া নেই, এই মতকে যারা ধরে রাখে, তা হল ভয়ঙ্কর কুসংস্কার। সুতরাং বিশ্বাসের প্রথম বৈশিষ্ট্য সত্য এবং দ্বিতীয়টা অহিংসা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কী? এটা হল *তিময় হত্তয়া। এটা নিম্নোক্তভাবে পরীক্ষা করা যায়। ভয় এবং প্রলোভন হল এমন দুটি চালিকাশক্তি, যা মানুষের চিত্তকে দুবষ্টল করে দেয়। উদাহরণ, তুমি তোমার ধমেষ্ট বিশ্বাস করো। তোমার বিশ্বাস বেশ পোক্ত এবং *ভীর। এখন কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এসো, আমি তোমাকে ২০ লাখ টাকা ন*দ দেব, তুমি কি তোমার বিশ্বাস বদলাবে?' এরপর যা ঘটতে পারে, তুমি চারপাশে তাকিয়ে দেখে নেবে, আশেপাশে এমন কেউ আছে কিনা, যে কথাটা শুনে ফেলতে পারে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কি সত্যিই আমাকে অত টাকা দেবে? সেক্ষেত্রে ধমষ্টনিয়ে আমার মাথাব্যথার তেমন প্রয়োজন নেই। তুমি কী করতে বলছো, বলো।' একইভাবে কেউ যদি তোমার বা তোমার শিশুর ঘাড়ে তলোয়ার ঠেকিয়ে বলে, 'হয় তুমি তোমার ধমষ্ট পরিবত্তন করো, নয় তুমি (অথবা তোমার শিশু) মরো।' তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে? তুমি নিশ্চিতভাবেই চিন্তা করবে, 'আ* তো *দষ্টনটা বাঁচাই, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। ঘাড়ের ত্তপর মাথাটা থাকলে যতবার খুশি টুপি বদলাতে পারব।' এরপরে তুমি তাকে বলবে, 'আমার জীবনের লাখ টাকা দাম। আমি তোমার খুশি মতো ধমষ্ট গ্রহণ করতে প্রস্তুত।' তুমি এমনত্ত মনস্থ করতে পারো, 'অবস্থার উন্নতি ঘটলে, আবার আমার আ*ের ধমেষ্ট ফিরে যাবো।' তুমি এটাকে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত বলতে পারো। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তুমি তোমার ধমেষ্টর প্রতি অনু*ত নত্ত। দুটো ক্ষেত্রেই বিশ্বাস নয় প্রলোভন ত্ত ভীতিই তোমায় তোমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে। এ ধরনের চরম অবস্থার কথা বাদ দিলে, এটা অন্যরকম হত্তয়া উচিত।

চতুথষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, বিশ্বাস থেকে তোমার মূল্যবোধভিত্তিক বিচার উঠে আসে। উল্টোদিকে কুসংস্কার তাকে চাপা দিয়ে দেয়। যখনই কোনো কিছুকে আমি আমার বিশ্বাসের অংশ বলে গ্রহণ করি, আমাকে তার মধ্যে থাকা মূল্যবোধকেত্ত মেনে নিতে হয়। যদি ভ*বান রাম আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে গুরুত্বপূণষ্টস্থান নিয়ে থাকেন, তাহলে যে মূল্যবোধ, সত্য এবং একনিষ্ঠতা (তাঁর স্ত্রীর প্রতি, সেই সময় একাধিক বিয়ে রীতি হত্তয়া সত্ত্বেত্ত) তিনি ধরে রেখেছিলেন, সেটাত্ত আমার কাছে গুরুত্বপূণষ্টহত্তয়া উচিত। কিন্তু মজার ঘটনা হল, রামকে মনেপ্রাণে মানা লোকেদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাত্তয়া দুষ্কর, যাঁরা ব্যক্তি*ত জীবনে দুটো মূল্যবোধ- সত্য এবং একনিষ্ঠতাকে আঁকড়ে আছেন। এ দেশে সত্য নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। 'সত্যমেব জয়তে' আমাদের মন্ত্র, এটা আমাদের জাতীয় প্রতীকে উশ্বকীণষ্ট করা আছে। কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলছে, অসত্যেরই জয়জয়কার। আমরা যাকে বিশ্বাস বলি, তাদের কারত্ত কারত্ত কাছে তা আনু*ত্য। বাকিরা একে সংবেদনশীল (অথবা কুটিল) বিশ্বাস বলে অভিহিত করেন। শব্দ বাছাইয়ের কথা থাক, যেটা গুরুত্বপূণষ্ট, তা হল, তুমি তোমার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করছি কি না। তুমি অন্যের বিশ্বাসকে সহ্য করছ কি না। এবং তাদের প্রতি কোনত্ত হিংসা করছ কি না। তোমার বিশ্বাস তোমাকে কাজে পরিচালিত করছে কি না।

যা সবচেয়ে গুরুত্বপূণষ্ট, তা হল তোমার বিশ্বাস তোমাকে মহত্ম মানুষ করে তুলছে, না একজন হীনচরিত্র করে তুলছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তোমার বিশ্বাসকে যাচাই করতে সাহায্য করবে। একমাত্র এই যাচাই করে চলাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বাস ত্ত কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা তাই এএনএস আন্দোলনের মতাদশষ্টত আলোচনায় গুরুত্বপূণষ্ট বিষয়। উমা

দধীচি দাভোলকর ও ঘুমকাতুরে ভদ্রলোক

আশীষ লাহিড়ী

"তিনি জানতেন যে এ ধরনের লড়াই চালাতে হয় যুগের পর যুগ ধরে। যে-পথ আমরা বেছে নিয়েছি সে-পথের প্রবর্তক কোপার্নিকাস। আমাদের আয়ু খুব কম, মাত্র সত্তর কি আশি বছর; ঐটুকু সময়ের মধ্যে যে-পরিবর্তন আমরা দেখতে পাব তা তো অতি সামান্য হবেই।"

—হামিদ দাভোলকর, ডাক্তার নরেন্দ্র অচ্যুৎ দাভোলকরের পুত্র

ডাক্তার দাভোলকরের শহিদ-হওয়া আর তার পিঠোপিঠি আসারামের বালিকা-ধর্ষণ কেলেঙ্কারি বাংলা প্রেসকে দিন কয়েকের জন্য একটা রোমাঞ্চকর ইশু-খোরাক দিল। কাঁহাতক আর সিপিএম-তৃণমূল-এর 'প্যান্তাফ্যাচাং তরকারি' (কপিরাইট নবদ্বীপ হালদার) খাওয়া চলে। অতএব জাগো বাঙালি। কাঁচা ঘুম থেকে জেগে উঠে হাতভর্তি আঙটি-পরা আঙুলে চোখ কচলাতে কচলাতে অকালজাগ্রত বাঙালিটি বললেন, 'ইস্, কুসংস্কার কী খারাপ, ভাল্লাগে না বাবা! তবে আমাদের গুরুদেব ওরকম না, বলো? ওঁর দেওয়া আঙটি আর মাদুলি পরেই তো হরিমতীর বিয়ের এগারো বছর পর বাচ্চা হল! তারপর সেই তান্ত্রিক সাধুর কথা মনে আছে, যিনি আমাদের জমির মামলাটা জিতিয়ে দিলেন! আর আজকাল তো বশীকরণ-বিশেষজ্ঞরা একেবারে কম্পিউটারে হিসেব করে বলেই দিচ্ছে এক ঘণ্টায় বশীকরণ, 'বিফলে মূল্য ফেরত'! যে যাই বলুক, কম্পিউটার তো আর কুসংস্কার নয়। গুরু, গুরু! তবে হ্যাঁ, আসারামটা ভারি দুষ্টু আর দাভোলকরকে এভাবে মারাটা ঠিক হয়নি।'

বিদ্বজ্জন বলে যে-একটা বর্গ তৈরি হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়াটা এর তুলনায় মার্জিত, কিন্তু বক্তব্য একই। সুচিত্রা ভট্টাচার্য নামক এক লেখিকা দেশ পত্রিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর) লিখেছেন, 'ভাবলে কষ্ট হয় এ দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখের দেশ। যাঁরা কোনোকালেই অলৌকিকতা বিশ্বাস করেননি, মানুষের শুভবোধকে জাগাতে চেয়েছেন জীবনভর। তাঁরা ছিলেন জাতির গর্ব। কিন্তু এইসব আসারামরা দেশের কলঙ্ক, জাতির লজ্জা। এঁদের প্রতি যুক্তিহীন ভক্তি ও অন্ধ মোহ থেকে দেশের মানুষ যত মুক্ত হবেন, ততই মঙ্গল!'

বাঙালি ভদ্রলোকদের— এবং ভদ্রমহিলাদের— ভাবের ঘরে চুরিটা এইখানেই। 'অবতার' শ্রীরামকৃষ্ণ যে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করতেন (যেমন জবা ফুলের রঙ বদলানো), বিবেকানন্দ যে বহু সময় অলৌকিক ঘটনায় সায় দিয়েছেন (যেমন ভণ্ড মানুষের বাড়ির উঠোন ফুঁড়ে গঙ্গার জল ওঠা, নিজের পূর্বজন্মের ঘটনা জানতে পারার স্বীকৃতি) এ তো নথিবদ্ধ ঘটনা। অথচ শ্রীমতী ভট্টাচার্যর মতো 'দেশ'-প্রসিদ্ধ লেখিকা এগুলো হয় জানেন না, না হয় জেনেও ভুল কথা লিখেছেন।

অনুরূপভাবে, লোকনাথ বাবার প্রাপ্তবয়স্ক বলে কথিত ভক্তরা বলবেন, জঙ্গলের মধ্যে ঘুমন্ত বাবাকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দুই হালুম-বাঘার আবির্ভাবটা তো জ্বলজ্যান্ত সত্যি। তবে অন্য বাবাদের কথা আলাদা। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রাজ্ঞ ভক্তরা বলবেন, গোঁসাইজি যে যখন তখন আকাশে উড়ে বেড়াতেন, ঠাকুরদেবতার সঙ্গে বিনা মোবাইলে কথাবার্তা বলতেন, এ তো সবাই জানে। অন্য বাবারা এসব পারতেন? সাঁইবাবার বিলিয়নেয়ার ভক্তরা বলবেন, অন্য গুরুরা যা করেন তা কেবল হাতের কারসাজি, আমাদের গুরু যা করেন সেটা কিন্তু যথার্থ যোগসিদ্ধাই। এমনি করে যে-যার নিজস্ব অযৌক্তিকতার গণ্ডি গড়ে নিয়ে বাকিদের বলছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ 'যদ্যপি মোর গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তদ্যপি মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়' (মুজতবা আলী উবাচ)। অন্যরা সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লম্পট, চোর, যেমন এই আসারামটা।

ডাক্তার নরেন্দ্র দাভোলকরের লড়াইটা যে এ-বাবা ও-বাবা সে-বাবার বিরুদ্ধে নয়, যাবতীয় অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীনতার ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে, এই সত্যটাকে না বুঝলে তাঁকে নিয়ে এত চোখের জল সবই কালীঘাট হয়ে টালি নালার পঙ্ককুণ্ডে গিয়ে মিশবে। অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীনতা অধিকাংশ লোকের সর্বনাশ করছে, আর অল্প কিছু লোককে পৌষমাসের পিঠে খাওয়াচ্ছে, এই সত্যটাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি। শুধু কোলাপুরের 'গো-মক্ষিকা বাবা'র বুজরুকি ফাঁস করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, অমিত-শক্তিশালী সত্য সাঁই বাবাকেও চ্যালেন্জ করেছিলেন। কুষ্ঠির ভয়ংকর সব ভবিষদ্বাণী দেখে ভীত মানুষদের কাছে তাঁর 'চলমান বিজ্ঞান ভ্যান' নিয়ে যেতেন, টেলিস্কোপ নিয়ে ধৈর্য ধরে আকাশে গ্রহ-তারকার গতিপ্রকৃতি বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন, ওসবের সঙ্গে জীবনের গতিপ্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। দেখাতেন, অম্বাভাই আর আর দত্তাত্রেয় মন্দিরের ভর হওয়া, পাগলপারা মহিলাটি আসলে বছরের পর বছর অপুষ্ট

থেকে, পারিবারিক লাঞ্ছনা সহ্য করে, বেশ কয়েকবার বিপজ্জনকভাবে সন্তান প্রসব করে, অবশেষে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছেন। প্রশ্ন তুলতেন, কেন ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপের আগে ফুলচন্দন দিয়ে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা? কেন সায়েবি ফ্যাশনের ক্যার্মা-র (Karma) দোহাই দিয়ে যাবতীয় অপকর্মের ব্যাখ্যা দেয় এদেশের শিক্ষিত (ডিগ্রীধারী বলা ভালো) মানুষ?

কিন্তু ওখানেই থেমে থাকেননি তিনি। তাঁর জেহাদটা নিছক বুদ্ধির বিনোদন হয়ে থাকেনি, লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লেখায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। লক্ষণীয়, 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি লিখতেন মরাঠি ভাষায়, মরাঠিদের মাতৃভাষায়। কেননা মানুষের কাছে পৌঁছতে হলে ও ছাড়া পথ নেই। আমাদের আংরেজি-মিডিয়াম-শিক্ষিত অ্যাক্‌সেন্ট-সচেতন উঁচকপালে বুদ্ধি-জীবিকাধারী বাঙালিদের চেয়ে শত যোজন দূরে ছিল তাঁর বাস। তাঁর সমাজকর্ম শুরু হয়েছিল মহারাষ্ট্রর সাতারা জেলায় 'এক গ্রাম, এক কূপ' আন্দোলন দিয়ে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জাতপাতের বন্ধন দূর করা আর গাঁয়ে গাঁয়ে কুয়ো-খোঁড়া, দুটো আলাদা আন্দোলন নয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জাতপাতের বন্ধন দূর করা আর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত সমাজ গড়ার আন্দোলন, দুটো আলাদা আন্দোলন নয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত সমাজ গড়ার আন্দোলন আর অন্ধশ্রদ্ধা দূর করার আন্দোলন দুটো আলাদা আন্দোলন নয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, অন্ধশ্রদ্ধা দূর করার আন্দোলন, গুরুবাবা-গুরুমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের থেকে আলাদা নয়। আর গুরুবাবা-গুরুমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে অবধারিতভাবেই অবশেষে কর্পোরেট মালিকদের রোষের মুখে পড়তে হবে, যারা এই বিরাট গ্রহরত্ন-বাজারটাকে চালায়, যারা ধর্মীয় আশ্রমের নাম করে কৃষকদের কাছ থেকে শত শত একর জমি হাতায়। কুসংস্কারের একটা ২৪ অ ৭ অ ৩৬৫ ঘণ্টার বিরাট কারখানা যারা চালু রেখেছে, টিভি আর সিনেমার মধ্যে দিয়ে। সেই ধর্ম-কর্পোরেট রোধেই প্রাণ দিতে হল তাঁকে।

আর একটা জায়গায় দাভোলকর আমাদের অনেকের চেয়ে আলাদা। তিনি আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখানোয় বিশ্বাসী ছিলেন। নিতান্ত সাদাসিধে ছিল তাঁর জীবন। নিরামিষাশী ছিলেন, মদ খেতেন না, কোনোরকম ধর্মীয় আচার পালন করতেন না। ছেলেমেয়েদের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করতেন এক ঘণ্টায়। এই নিদারুণ বৈষম্যপীড়িত সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বড়োলোকিয়ানা দেখানোর অশ্লীলতাকে ঘৃণা করতেন তিনি, এর বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। নিজে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্রিকার অফিসঘরে ঝুলত গান্ধিজীর একটি উদ্ধৃতি। বহু মানুষের কুঞ্চিত ভুরু উপেক্ষা করে ছেলের নাম রেখেছিলেন মহারাষ্ট্রর বিখ্যাত মুসলমান সমাজ-সংস্কারক হামি দালোয়াই-এর নামে। অনেকেরই ভুরু সেদিন কুঞ্চিত হয়েছিল। কখনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নাম করে আক্রমণ করতেন না, ঈশ্বর আছেন কি নেই, সেই তর্কে প্রাণপাত করতেন না; কিন্তু অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অমানবিক সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে ছিলেন ক্ষমাহীন। আশ্চর্যের— অথবা হয়তো প্রত্যাশিত— ব্যাপার এটাই যে কখনো কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম করে আক্রমণ না-করা সত্ত্বেও হিন্দু দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো তাঁর ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছিল। বেশ কয়েকবার তাদের গুণ্ডারা মারধর করেছে তাঁকে, একবার তো কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। গ্রাহ্য করতেন না দাভোলকর, বরং প্রবলতর উদ্যমে স্থাপন করতেন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচি, যাতে এইসব শিক্ষকরা ইস্কুলে ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী চিন্তায় দীক্ষিত করতে পারেন। বাস্তুশাস্ত্রের নাম করে যে-জোরদার ব্যবসা চলে তার বিরোধী ছিলেন বলে নিজের বাড়ি বানিয়েছিলেন দক্ষিণমুখী করে, যা বাস্তুশাস্ত্রে অমঙ্গলের পরিচায়ক। 'সাধনা' কাগজের নির্বাহী সম্পাদক বিনোদ শিরাট বলেছেন, 'ওঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা অনেকেই দক্ষিণমুখী বাড়িতে থাকাই পছন্দ করতাম, যেহেতু এর ফলে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড কী তা প্রচার করা যাবে এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত চিন্তাধারার বিরোধী যে কোনো বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যাবে।'

সুখের বিষয় এই যে, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা সর্বতোভাবে তাঁর এই চিন্তাধারায় সামিল ছিলেন। স্বামী এবং পিতার মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিতে কোনোরকম ধর্মীয় আচরণ পালন করেননি তাঁরা। এমন একজন মানুষ যে দেহদান করে যাবেন, তা তো স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু আততায়ীর গুলিতে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাতে হয়, সেইজন্য দেহদান সম্ভব হয় নি।

এখন হয়তো নিষ্ঠুর অমানবিক ধর্মব্যবসায়ী বাস্তুশাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বলবে, বাস্তুশাস্ত্র না-মানার জন্যেই তাঁকে বেঘোরে মরতে হল। ঠিক যেমন, সনাতন ধর্ম সংস্থার তাত্ত্বিক নেতা জয়ন্ত অথভলে তাঁর নিজস্ব ব্যান্ডের মানবিকতার পরিচয় দিয়ে প্রকাশ্যে বলেছেন, আততায়ীর হাতে খুন হওয়াটা দাভোলকরের কর্মফল; ভালোই তো হয়েছে, ডাক্তারের ছুরি খেয়ে, অপারেশন টেবিলে মরার চেয়ে এ তো ভালোই!

আর এতসবের পর আমরা বাঙালি ভদ্রলোকেরা বলব, কেন ভাই, জ্যোতিষশাস্ত্র আর ঠাকুরদেব্‌তা মেনে সচিন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি আর অমিতাভ্ বচ্চনের তো ভালোই হয়েছে!

প্রতিবাদে সামিল গণসংগঠন

গত ২০ আগস্ট সকালে পুণের ওঙ্কারেশ্বর মন্দির লাগোয়া সেতুতে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হন ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে পুণের সাসুন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান মহারাষ্ট্রে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর (১৯৪৫-২০১৩)। দেশজুড়ে পরিব্যাপ্ত নানা চেহারার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর ধরে ক্লান্তিহীন লড়াই করতে থাকা সৈনিক ডাঃ দাভোলকর খুন হলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কবাডি খেলোয়াড়। ভারতীয় কবাডি দলের অধিনায়ক হিসাবে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ। পড়েছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্র। ১৯৮৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মহারাষ্ট্র অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'। মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য তৈরি করেছিলেন এই সংগঠন। পাশাপাশি 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমেও মারাঠি ভাষায় তাঁর যুক্তিবাদী ভাবনার কথা মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর সংগঠন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে মহারাষ্ট্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই সংগঠন 'বিজ্ঞান সোধ' নামক একটি পাঠ্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব সমাজ তথা বিদ্যার্থীদের যুক্তিবাদী মনকে সমৃদ্ধ করা ও তাদের কুসংস্কারের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে মহারাষ্ট্রে কুসংস্কার বিরোধী বিল পাস করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন দাভোলকর। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের চর্চা ও প্রচারকে 'আইনের চোখে অপরাধ'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় পেশ ও অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া বিল ২০০৩ সালে জমা দিয়েছিলেন। এই বিলটি যাতে আইনে পরিণত না হয় তার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন সরকারের ওপর তীব্র চাপ দিতে থাকে। বিলটি এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় পেশ করা হয় নি।

ধর্মকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের এখন রমরমা বাজার। এই ব্যবসায়ীরা সর্বদা সচেষ্ট। প্রগতিশীলতার পথগুলিকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষের ওপর আক্রমণ ও হত্যা নয়, তাঁর আজীবন চর্চিত নীতি ও আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা।

ডাঃ নরেন্দ্র দাভোকরের হত্যার প্রতিবাদে গত ৮ সেপ্টেম্বর কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের সামনে সারাদিন ব্যাপী এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পথসভায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য পেশ করেন। এই দিনের প্রতিবাদ সভায় যে দাবিগুলি নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা সোচ্চার হয় সেগুলি হল—

১) ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকরের প্রস্তাবিত বিলটির অসংশোধিত রূপকে আদর্শ করে অনুরূপ বিল কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভায় পেশ করতে হবে এবং সেটিকে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২) যতদিন না আইন হচ্ছে, ততদিন বিভিন্ন গণমাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকার উভয়কেই এই হত্যার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এই প্রতিবাদ সভাটি যৌথভাবে যারা আয়োজন করে— ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব, সানডে সিটিং, বাঁশবেড়িয়া, হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ, নৈহাটি ইন্সস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি, দমদম সায়েন্স ক্লাব, গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইন্সস্টিটিউট, হাওড়া বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা, বিজ্ঞানমনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ, অনুসন্ধিৎসু, পরিপ্রশ্ন, ঐকতান, চিরহরিৎ এবং উৎস মানুষ।

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

গত ২০ আগস্ট পুনে-তে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রামী, যুক্তিবাদী ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকরকে আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদে একটি আলোচনা সভা ও কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল 'হাওড়া বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়', গত ১ সেপ্টেম্বর, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি হলে। ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু, জয়দেব সান্যাল, সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ দাস প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন। ডাঃ দাভোলকরের জীবন ও কাজের ওপর একটি ছোট্ট তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। এই তথ্যচিত্র থেকে ডাঃ দাভোলকরের জীবন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়।

৬৯ বছর বয়সী ডাঃ দাভোলকরকে শেষ পর্যন্ত আততায়ীরা হত্যা করে তাঁর কণ্ঠকে স্বধ করে দিল। এই হত্যাকে কেউ কেউ হিন্দু উগ্রপন্থীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে হাওড়া বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়-এর পক্ষ থেকে

পরের পাতায়

ডাঃ দাভোলকর-এর হত্যাকারীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে অনুরূপ কুসংস্কারবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও এই রাজ্যের মতো করে ঐ আইন প্রণয়নের দাবিও জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান 'অলৌকিক নয় নিছক ম্যাজিক' পরিবেশিত হয়, হল ভর্তি ঐ আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট কলকাতার আকাদেমি অভ ফাইন আর্টসের সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চর পক্ষ থেকেও ডাঃ দাভোলকরের হত্যার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

উমা

চেতনা-র প্রতিবাদ

হাতিবাগানের চেতনা গণসংস্কৃতি পরিষদ ডাঃ অচ্যুত দাভোলকরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৪ আগস্ট উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার লাগোয়া ফুটপাতে একটি সভার আয়োজন করে। কলকাতার বেশ কিছু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন ও ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে খুনিদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। চেতনার পাভেল চক্রবর্তী সভাটি পরিচালনা করেন। আশীষ লাহিড়ী, তুষার চক্রবর্তী, সৃজন সেন প্রমুখ দাভোলকরের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলিকে দাভোলকরের লেখাগুলি মারাঠি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে আবেদন করেন। তুষার চক্রবর্তী প্রসঙ্গত পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তপন দত্ত ও বিজন ষড়ঙ্গীর হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেন। সৃজন সেন জ্যোতিষী ও গুরুবাবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত আচরণে কুসংস্কারমুক্ত হওয়া যে কতটা জরুরি সে কথা মনে করিয়ে দেন। চেতনার সদস্য সুদীপ্ত ঘোষালের 'অলৌকিক নয় ম্যাজিক' প্রদর্শনীটি বেশ উপভোগ্য হয়। হাতিবাগানের জ্যামে আটকে পড়া ট্রামবাস থেকে যাত্রীদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যায়। সুদীপ্তর আক্ষেপ— 'সেই গোঁফ না ওঠা বয়স থেকে চালিয়ে যাচ্ছি, গোঁফ পেকে গেল নতুন ছেলেমেয়েরা তো আর এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছে না!'

বরুণ ভট্টাচার্য

উমা

পাঠকদের কাছে আবেদন

আমরা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাপত্র নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে চলেছি। এই কাজের শুরু হিসাবে ইতিমধ্যেই অন্য পত্রপত্রিকায় ছাপা লেখা আমাদের পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তার বাইরেও রয়েছে অনেক। কারও কাছে তেমন লেখা বা চিঠিপত্র থাকলে আমাদের দিতে পারেন। বইতে সঙ্কলিত হতে পারে।

— পরিচালকমণ্ডলী

জৈব ফসল : যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো

কৌশিক মজুমদার

গপ্পো : সভ্যতার সেই আদিযুগে কৃষিকাজ ছিল সম্পূর্ণ পরিমাণে জৈব সার, পশু আর মানুষের শক্তির সমন্বয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলন্ড সুপার ফসফেট সার প্রস্তুত হয়। এর পরে পরেই রাসায়নিক ভাবে অ্যামোনিয়ার আবিস্কার গোটা ইউরোপ ও আমেরিকায় রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের পথ খুলে দেয়। ১৯১০ সালে আমেরিকায় প্রথম ট্রাক্টর আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে বাজার ছেয়ে ফেলে ডি ডি টি, বি এইচ সি-র মতো কীটনাশক, ২,৪-ডি এম সি পি এ-র মতো আগাছা নাশকরা। ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে গেল হু হু করে। 'গ্রো মোর ফুড' স্লোগানকে সামনে রেখে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে এল সবুজ বিপ্লব। সঙ্গে ছিল নিত্যনতুন সঙ্কর ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের বীজ। ফলে ভারতেও ৬--এর দশকের সবুজ বিপ্লবের ফলে ফসল উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল। আরও বেশি সংখ্যক মানুষের বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান করল কৃষিকাজ।

কিছু পদ্মে যেমন কণ্টক, তেমনি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত আর বেহিসেবি কীটনাশকের ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকটা প্রতিভাত হল অচিরেই। খাদ্যশস্য এবং ফল-সবজিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক ও তাদের বাই-প্রোডাক্টগুলি সরাসরি কিংবা জলের মাধ্যমে প্রবেশ করল মানুষ ও পশুদের দেহে। যেহেতু এরা জীবদেহের ফ্যাট টিস্যুগুলিতে জমা হয়, তাই প্রাণীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এমন কী লিভারে, স্তনগ্রন্থিতে জমা হতে থাকল এই কীটনাশকের অণুগুলি। খাদ্য পিরামিডের ওপরের দিকে থাকা প্রাণীরা অথবা মরা-খেকো পাখিরা (শকুন, চিল) ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশি। শকুন তো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। উন্ন দেশগুলেত মানুষজন নড়েচড়ে বসলেন। বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান সোচ্চার হল রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের এই ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে। আর সেই থেকেই জৈব কৃষি ও জৈব খাদ্য উৎপাদনের কথা উঠে আসে। এ হল যাকে বলে "Back to the Basics"। জৈব কৃষির বিভিন্ন দিক, উপায়, পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে গঠিত হয় IFOAM বা International Federation of Organic Agriculture Movement। প্রথমে ততটা সাড়া না মিললেও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক থেকে সৃষ্ট রোগ ব্যাধির ভয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার চিন্তা, ধীরে ধীরে জৈব কৃষির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়েছে। শুধুমাত্র উন্নততর এবং রাসায়নিক মুক্ত ফসলই নয়, জৈব কৃষি এক উন্নততর পরিবেশেরও স্বপ্ন দেখায়।

খাদ্যশস্য এবং ফল-সবজিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক ও তাদের বাই-প্রোডাক্টগুলি সরাসরি কিংবা জলের মাধ্যমে প্রবেশ করল মানুষ ও পশুদের দেহে। যেহেতু এরা জীবদেহের ফ্যাট টিস্যুগুলিতে জমা হয়, তাই প্রাণীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এমন কী লিভারে, স্তনগ্রন্থিতে জমা হতে থাকল এই কীটনাশকের অণুগুলি। খাদ্য পিরামিডের ওপরের দিকে থাকা প্রাণীরা অথবা মরা-খেকো পাখিরা (শকুন, চিল) ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশি। শকুন তো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

যুক্তি : কি এই জৈব কৃষি? IFOAM-র মতে জৈব কৃষিতে প্রকৃতির নিজস্ব ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয় রোগ-পোকার দমনে। ঠিক যেমন পচা লতাপাতা, গোবর, সবুজ সার, বিভিন্ন উপকারী ব্যকচেরিয়া ও ছত্রাককে প্রয়োজনীয় সার উৎপাদনে লাগান হয়। গো-খাদ্য বা পোলট্রির খাদ্য ও উৎপন্ন হয় জৈব পদ্ধতিতেই। রাসায়নিক সার, কীটনাশক, হরমোন বা জিন-ম্যানিপুলেশন-এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন একেবারে বন্ধ। ফলে উন্নত হবে ফসল— বাঁচবে প্রকৃতি।

কার্যক্ষেত্রে জৈব কৃষিকে জনপ্রিয় করার জন্য দেশে দেশে কমিটি স্থাপন হল। আমাদের দেশেও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে পরিচালন কমিটি ও APEDA, জৈবকৃষি বিষয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করেন। চাষীরা জৈব খামার স্থাপন করতে চাইলে প্রথমে

IFOAM বা সংশ্লিষ্ট ফসলের বোর্ড (কফি বোর্ড, টি বোর্ড, কাজু ও কোকো বোর্ড)-এর থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। তারা সেই জৈব খামারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে নিদান দেন যে এই খাদ্য সত্যিই 'জৈব খাদ্য'। তবে ফসল বিক্রি নিয়ে চাষীর মাথাব্যাথা কম। এপিইডিএ তার দায়িত্ব নেয়। 'India Organic' ব্র্যান্ড নাম নিয়ে দেশে ও বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয় সেই ফসল। কিন্তু এই সার্টিফিকেট পেতে চাষীকে কী কী করতে হয়? জমিকে ও খামারকে প্রথমত রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে জৈব খামার তৈরির জন্য। IFOAM থেকে দেখে যাবে এই জমি জৈব ফসল তৈরির উপযোগী কি না। জৈব খামারে অন্তত ৩ বছর আগে থেকে কোনওরকম রাসায়নিক ব্যবহার নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়। জমিতে ব্যবহৃত জৈব সার, বীজ, পশুখাদ্য, সেচের জল— সবকিছু পরীক্ষা করে তবেই সেই জমিকে জৈব খামারের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে ফসল উৎপাদনের প্রতিটি অংশে, ফসল কাটা এমন কি সংরক্ষণের সময়ও IFOAM থেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা করা হয়। চাষী জৈব খামারের সব নিয়ম মানছে কি না। কোথাও নিয়মের কোনো রকম হেলদোলে সঙ্গে সঙ্গে 'জৈব খামার' উপাধি কেড়ে নিয়ে চাষীকে আর্থিক শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। খামারে যে জৈব সার, গোবর সার ব্যবহার হয় তারও উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে চাষীকে সচেতন থাকতে হয়। যেমন সচেতন থাকতে হয় ব্যবহার্য বীজ নিয়ে— যা অবশ্যই জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন হতে হবে।

তবে এত কষ্ট করে যে ফসল চাষী উৎপাদন করবেন, তার বাজার কিন্তু বেশ ভাল। শুধু দেশীয় নয়, বিদেশের বাজারে জৈব ফসল ও জৈব খাদ্যের এখন খুব দর। ২০০৩ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ১১,৫০০ কোটি টাকার (২৬ বিলিয়ন ডলার) জৈব খাদ্য বিক্রি হয়। অনুমান করা হয় ২০২০ সালে এই বিক্রি বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১০২ বিলিয়ন ডলারে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ জমিতে জৈব ফসল চাষ হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে কম হয় ভারতে (০.০৩%) আর সবচেয়ে বেশি হয় অস্ট্রেলিয়াতে (১১.৩%)। ভারতের জৈব ফসল সারা বিশ্বের নিরিখে ১ শতাংশেরও কম। তার মধ্যেও সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় বাসমতি চাল। ১০ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের জৈব খামারগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতে যেখানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এমনিতেই খুব কম ব্যবহৃত হয়। তবে এখনও অবধি ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি জৈব ফসল তৈরি হয় মধ্যপ্রদেশে। তারপর উত্তরাঞ্চলে। জৈব ফসলের বিশ্ববাজার ধীরে ধীরে চাষীদের উৎসাহিত করছে জৈব কৃষিতে। বড়লোক খদ্দেররা উন্নতমানের জৈব ফসলের জন্য বেশি দাম দিতেও প্রস্তুত। রিলায়েন্স, কে-মার্ট বা অন্যান্য বিশ্বখ্যাত সুপারমার্কেট চেন এমনকি দেশীয় বিগবাজারেও বিপণি আলো করে আছে জৈব খাদ্য। এই বাজারই কৃষককে প্রাণিত করবে জৈব ফসল উৎপাদনে। জৈব ফসলের সুদিন আসন্ন।

তক্কো : শুনতে যতই ভাল লাগুক না কেন, জৈব সার ও কীটনাশকের উৎপাদনশীলতা কখনই রাসায়নিক সারের ধারেকাছে যেতে পারে না। পারবেও না। গাছের অত্যন্ত উপযোগী অণুখাদ্য (যেমন বোরন, মলিবডেনাম) দিতে গেলে রাসায়নিক ছাড়া উপায় নেই। তাই বড় মাপের উৎপাদনের পথে যেতে গেলে জৈব ফসলের উৎপাদন মার খাবে প্রচণ্ড। ফলে যত দামেই বিক্রি হোক না কেন, চাষের খরচ ওঠা মুশকিল। বলা হয় জৈব খাদ্যের নাকি স্বাদ ভাল, বেশি পুষ্টিগুণসম্পন্ন এমন কি খাদ্যগুণও বেশি। কিন্তু আদতেই তা কিনা, সে নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্যদিকে জৈবখামারে নাকি সব কিছু জৈব ব্যবহার করা হবে। গরুকে জৈব ঘাস খাইয়ে জৈব গোবর নিয়ে জৈব খামারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই জৈব ঘাস কোথায় তৈরি হবে? তাতে জৈব গোবর দেবে কে? উত্তর নেই। যেমন উত্তর নেই জৈব বীজ ব্যবহার নিয়ে। পাশাপাশি জৈব কৃষির মুশকিল আছে আরও, ধরা যাক একজন চাষী জৈব খামার বানালো। অদূরেই অন্য একজনের রাসায়নিক সার— কীটনাশক দেওয়া জমি। একে তো সেই সব রাসায়নিকের জৈব খামারের শুদ্ধতা নষ্ট করার সম্ভাবনা, তার ওপর পোকামাকড় সব অন্য জমিকে ছেড়ে জৈব খামারেই বাসা বাঁধবে। ফলে উৎপাদন ধাক্কা খাবে অনেকটাই। তাই অনাহার ও অপুষ্টিতে ভোগা আমাদের এই দেশে চড়া দামের জৈব ফসল শুধুমাত্র বড়লোকদের বিলাসিতাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। 'Class'-এর বদলে 'Mass'-এর মধ্যে জৈব ফসল ছড়িয়ে পড়া দূর অস্ত। বিখ্যাত নোবেলজয়ী কৃষিবিজ্ঞানী নরমান-ই বোরলগের উক্তি দিয়েই শেষ করি, 'Switching on food production to organic would lower crop yields. We can use all the organic that is available but we are not going to feed six billion people with organic fertilizer or material'।

উমা

মন্ত্রের প্র-সাধন, শরীরের পাতন

জয়ন্ত দাস

পাড়ার সেলুনে চুল কাটতে গেছি, ওমা, দেখি সেলুন ভ্যানিশ! সেখানে নতুন সাইনবোর্ড ঝুলছে — 'হেয়ার ড্রেসিং অ্যান্ড বিউটি ট্রিটমেণ্ট ক্লিনিক'। তাতে শ্যাম্পু, ম্যাসাজ, কার্ল এসবের পাশাপাশি 'হেয়ার ট্রিটমেণ্ট' করে রূপবান ও রূপবতী হবার আহ্বান। আমাদেরই পাড়ায় কীরকম সব ঝাঁ-চকচকে ক্লিনিক-টিনিক হয়ে উঠছে দেখে বড় ভাল লাগল। কিঞ্চিৎ ঘাবড়েও গেলাম। এইসব ডাক্তারি ব্যাপার, ট্রিটমেণ্টের মধ্যে চুল কাটার কথা বললে আবার ধরে কড়কে দেবে না তো! ইতি-উতি তাকিয়ে দেখি, পুরনো দোকানের 'বাবা তারকনাথ সেলুন' নামটা নতুন সাইনবোর্ডের ওপরে ছোট্ট করে লেখা আছে। দেবদেবীদের এই এক সুবিধে, ঠাঁই-নাড়া করে কোপদৃষ্টিতে পড়ার ঝুঁকি চট করে কেউ নিতে চায় না। সাহস করে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে পড়তেই দেখি পুরনো মালিকের ছেলে নেপু। এসে বলে কাকু, চুল কাটবেন তো? তার সঙ্গে একটু ইস্পেশাল ডাই করে দিই, সামনের পাকা চুলগুলো রাখবেন না। আর বলেন তো মুখে একটা নতুন 'পোডাক্ট' দিয়ে খানিক 'টিটমেণ্ট' করে দেব, কাকিমাও ভাববে নতুন করে আবার কলেজে ভর্তি হলেন নাকি, হেঁ হেঁ!

ডাক্তারি নাকি?

এদের 'ট্রিটমেণ্ট' ও 'ক্লিনিক' ব্যাপারটা কী। প্রচলিত অর্থে, 'ট্রিটমেণ্ট' আর 'ক্লিনিক' শব্দ দুটো থেকে মনে হয় যেন ডাক্তারি ব্যাপার। অভিধান খুললে দেখব, 'ট্রিটমেণ্ট' কথাটার দুটো অর্থ দেওয়া আছে। এক, আচরণ। দুই, মেডিকেল ব্যবস্থা। 'হেয়ার ট্রিটমেণ্ট' বলতে যে চুলের প্রতি বিউটিসিয়ানের 'আচরণ' বোঝানো হতে পারে, সে কথা বুঝতে গেলে উকিল হতে হয়। কিন্তু 'ক্লিনিক' কথাটার অর্থ অতি পরিষ্কার, সেখানে উকিলি মারপ্যাঁচেরও জায়গা নেই। ক্লিনিক হল ডাক্তারি ট্রিটমেণ্ট বা ডাক্তারি উপদেশ দেওয়ার জায়গা। কথা দুটোর কেমন অপব্যবহার চলছে খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই।

নেপুকেই সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেললুম, তা বাবা, 'ট্রিটমেণ্ট', 'ক্লিনিক' এগুলো তো ডাক্তারি ব্যাপার, সাইনবোর্ডে তুমি লিখছ কোন হিসেবে? সে হেসে বলল, এই দেখুন, আগে করতুম কলপ, এখন সেটাকে বলছে ডাই করা। আর আমার বাবার দোকানটাকে সেলুন থেকে পার্লার বললে ক্ষতিটা কী? পার্লারই যদি বলি তবে সব পার্লার যেমন বলছে, তেমনি কিলিনিক টিটমেণ্ট না বললে চলবে কেমন করে? অকাট্য যুক্তি, জজে মানবে, আমি তো নেহাত এলেবেলে।

কী করছো তোমার পার্লারে?

কেন, চুল কাটা থেকে ফেসিয়াল— সব।

চুল কাটা শিখতে হয় না?

হয় না আবার! ওই দেখুন না, ডানদিকের চেয়ারে। দু'বছর হয়ে গেল, এখনো সব কাট শিখে উঠতে পারে নি। একি আর কলপ করা? মাথা ধুয়ে খানিক ব্রাশ চালালেই কাজ খতম!

তা ফেসিয়াল করতে শিখতে হয় না?

ফেসিয়াল তো সোজা ব্যাপার। গুটিকয় ক্রিম-ট্রিম মুখে ঘষা, অনেকটা ঘুড়ির সুতোতে মাঞ্জা দেওয়ার মতো, হেঁ হেঁ। আর মশাই লাভও বেশি।

আর কনে সাজানো?

হ্যাঁ, ওই ফেসিয়াল করে তার ওপর খানিক ডিজাইন করা শিখতে হয়। এটাই তো সবচেয়ে লাভের কারবার। সেলুন থাকলে এসব হত!

ফেসিয়াল করতে গিয়ে কারো কখনো মুখে কিছু জ্বালাটালা হয় না? হলে কী কর?

তা হয়। সে তো মশাই ডাই করতে গিয়েও হয়, আকচার হয়। হলে বলে দি, এ ফেসিয়াল আপনার সুট খাচ্ছে না, অন্য একটা করান। তাতে দুনো লাভ— তখন সে নিঘ্‌ঘাত হার্বাল ফেসিয়াল করাবে, খরচা বেশি।

এ হল আমার পাড়ার সেলুন-কাম-পার্লার। একটু 'পশ' এলাকার চিত্র অতীব গম্ভীর। সেখানে এই যন্তর সেই যন্তর। সেসব থেকে তার বেরিয়ে আছে, আর সেই তার প্লাগ দেয়ালে ঢুকিয়ে বেশ ঘর্ঘর আওয়াজে যন্ত্র মুখে মাথায় পালিশ করে দিচ্ছে। হঠাৎ ঢুকলে মনে হয়, অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলাম নাকি বাবা, কিংবা আই সি ইউ। আসলে কিন্তু ওই নেপুরই বড়দাদা সব।

তবু বলব এইগুলোতেও তেমন অসুবিধে নেই। যদিও এরা লেখে বটে হেয়ার ট্রিটমেণ্ট, স্কিন ট্রিটমেণ্ট। আমার মতো নেহাত আনাড়ি লোক ছাড়া সব্বাই জানে যে এসব আর যাই হোক ডাক্তারি নয়। কিন্তু যখন দেখি নানারকমের বিজ্ঞাপনে লেখা হচ্ছে

বহু গবেষণালব্ধ এই কসমেটিক ওই ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করুন, তখন একটু খটকা না লেগে পারে না।

বিজ্ঞাপনের কথা : দেখুন তো, সকালের খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে গিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো আপনারও চোখে পড়েছে কি না? অমুক শেঠ-এর তেল মেখে টাকে চুল গজাচ্ছে, তমুক হুসেইন-এর ক্রিম মেখে মুখের দাগ উধাও, আর অন্য একজনের 'প্রোডাক্ট' লাগিয়ে চোখেমুখে ফুটে উঠছে যৌবনের জেল্লা? ও, খবরের কাগজ পড়ার সময় পান না বুঝি? তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু এসে যায় না, যে কোনও মিডিয়ায় প্রসাধনের মহিমা কীর্তনে অজস্র বিজ্ঞাপন আপনি দেখতে পাবেন। টিভি, রাস্তার হোর্ডিং— সব জায়গায় আপনি দেখবেন রূপচর্চার হাতছানি। টিভিতে শাহরুখ খান থেকে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত, সকলেই আপনাকে ফর্সা আর গ্ল্যামারাস করার টিপস দিতে ব্যস্ত। আর কে না জানে ফর্সা না হলে নারীজন্মই বৃথা। তবে নরজন্মও নেহাত ফেলনা নয়, তাদের রং ফর্সা করার ক্রিম বাজারে এসেছে। হাজার হোক, সম্ভাব্য ক্রেতাদের অর্ধেককে মাল গছানোর সুযোগ খামোকা ছাড়ে কোন বুদ্ধু! সুতরাং বিজ্ঞাপনে আপনাকে ফরসা করার প্রতিযোগিতা চলছে।

হার্বাল হলেই ভাল এবং অ-ক্ষতিকর, এটা সমস্ত প্রসাধনদ্রব্যের ক্ষেত্রেই অতি প্রচলিত কিন্তু ভিত্তিহীন কথা।

কিন্তু সত্যি সত্যি কতটা করতে পারে এইসব 'বিউটি প্রোডাক্ট'? এরা যা যা বলছে সেসবের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি? সমস্ত প্রসাধনদ্রব্য নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়, তাই চুল গজানোর নানা প্রসাধনদ্রব্য নিয়ে দু'চার কথা বলব।

টেকোমাথায় চুল গজানোর দাবি করে যেসব প্রসাধনদ্রব্য তারা সবাই একগোত্রের নয়। প্রথম গোত্রে আছে খুস্কি তাড়ানোর নানাবিধ ব্যবস্থা। এদের মধ্যে শ্যাম্পুর চল সবচেয়ে পুরনো, আর অনেক শ্যাম্পু বেশ কার্যকর। সমস্যা হল, প্রসাধনদ্রব্যের বাজারে কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে খুস্কির নানা বাজারচলতি ব্যবস্থার মধ্যে কোনটা কাজের আর কোনটা স্রেফ ভস্মে ঘি ঢালা, সেটা বোঝার কোনও নিয়ম নেই— মুড়ি-মিছরির একদর। তবু সাধারণ খুস্কিতে বাজারচলতি খুস্কি-তাড়ানো শ্যাম্পুগুলোর অনেকগুলোই বেশ কাজ দেয়। খুস্কি হলে চুল পড়ে, তাই যেখানে খুস্কি আর চুলপড়া দুই-ই থাকে সেখানে খুস্কির শ্যাম্পু কাজে দিতে পারে। কিন্তু আবার বলি, কোন শ্যাম্পুটা কাজে দেবে, সেটা জানার কোনও নিয়ম নেই। আর হার্বাল শ্যাম্পু হলেই চুলের পক্ষে ভাল এবং খুস্কিবধে অব্যর্থ, এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। হার্বাল হলেই ভাল এবং অ-ক্ষতিকর, এটা সমস্ত প্রসাধনদ্রব্যের ক্ষেত্রেই অতি প্রচলিত কিন্তু ভিত্তিহীন কথা।

সমস্ত ক্ষেত্রে চুল পড়ার কারণ খুস্কি নয়। তাই খুস্কি সারিয়ে সবার চুলপড়া আটকানো যায় না। কিন্তু বাজারে হাজাররকমের তেল, শ্যাম্পু, এমনকি ট্যাবলেট-ক্যাপসুল 'টনিক' ইত্যাদি যে কোনও চুলপড়া রোধের অব্যর্থ ওষুধ হিসেবে বিক্রি হয়। সোজা কথাটা সোজা ভাষায় বলাই ভালো— এগুলো নেহাত লোকঠকানো। ভারতে চালু নানা আইনের মধ্যে ফাঁকফোকর বিস্তর। আর আইন প্রয়োগ তো হয় না বললেই চলে। নইলে সরকারি আইন The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) ও Act The Drugs and Cosmetics Act and Rules-এর নানা ধারা-উপধারা এবং তাদের বিভিন্ন সংশোধনী অনুসারে এইসব বিজ্ঞাপন ও 'কসমেটিকস'-এর বিরুদ্ধে সরকার নিজেই, অথবা না কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে, অনুসন্ধান চালিয়ে এগুলো বন্ধ করতে পারত। করা উচিতও ছিল। কেন বলছি একথা? বলতে গেলে চুল পড়ার কারণ নিয়ে দু'চারটে কথা বলতে হয়।

চুল পড়ে, টাকা ঝরে : সবার চুল একটাই মাত্র কারণে পড়ে যায়, তা নয়। আর আজকে যার খুস্কির জন্য পড়ছে, কাল তাঁর চুল অন্য কারণে পড়বে না, এমন কোনো কথা নেই। সুতরাং সবার জন্য সবসময় চুল পড়ার একটিমাত্র মহৌষধ— এই ব্যাপারটিই ধাপ্পাবাজি। এটা বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার কিছু নয়। থাইরয়েডের রোগে চুল পড়ে, চুল পড়ে অ্যানিমিয়াতেও। মেয়েদের বাচ্চা হবার কিছুদিন পরে চুল পড়ে যায়, আর অনেক ছেলের মাথায় টাক পড়ে জেনেটিক কারণে। এটা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে এক কথাতেই বুঝে যান। বিশেষ করে শেষ দুটো উদাহরণ তো সবাই নিত্যদিন নিজের চোখেই দেখে থাকেন। অথচ বাজারে বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখেই বোঝা যায়, যে কোনও কারণে চুলপড়া রোধের অব্যর্থ ওষুধের বেশ ভাল বিক্রি। যেমন সম্প্রতি 'কেশ পরী' নামে একটি 'আসল আয়ুর্বেদিক' ব্র্যান্ড বাজারে এসেছে। বিজ্ঞাপনের বহর দেখেই বোঝা যায়, বিরাট ব্যবসা করছে সেটি। বড় বড় খবরের কাগজে পাতাজোড়া রঙিন বিজ্ঞাপন। একই সঙ্গে 'কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট আয়ুর্বেদিক তেল', ক্যাপসুল ও হেয়ার ওয়াশ। ভাবুন একবার, তিন-তিনটে জিনিস মানুষ কিনছেন যে কোনও চুলপড়া রোধের জন্য। বিজ্ঞাপন জানাচ্ছে, 'ফল শুরু প্রথম দিন থেকে। কমপ্লিট কোর্স তিন মাসের। মহিলাদের, পুরুষদের ও বাচ্চাদের জন্য সমানভাবে কার্যকর।' তিনমাসে হাতে গরম ফললাভের আশায় লোকে কিনছেন, তারপর 'দুচ্ছাই' বলে ফেলে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু ততদিনে কোম্পানির হাতেগরম ফল 'লাভ' যা হবার তা হয়ে গেছে।

'কেশ পরী'-র ওপর আমার আলাদা কোনও বিতৃষ্ণা নেই, বা এই বিশেষ ব্র্যান্ডটিকেই খারাপ বলাটা মোটেই আমার উদ্দেশ্য

নয়। কথাটা হল, মহিলাদের, পুরুষদের ও বাচ্চাদের জন্য সমানভাবে প্রথম দিন থেকে কার্যকর তিন মাসের কমপ্লিট কোর্স— এই ধারণাটাই অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু প্রসাধনের বাজারে বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানকে আলাদা করার কোনও প্রক্রিয়া নেই। সবই প্রচার। সাধারণ মানুষ হল সেই কামধেনু, যাকে যথেচ্ছ দোহন করে ইপ্সিত জিনিস পাওয়া যায়। আমি বলছি না সব প্রসাধন, সব কোম্পানি, এইভাবে লোক ঠকায়। সমস্যা হল, কে ঠকায় আর কে ঠকায় না, সেটা জানার জন্য কোনও ব্যবস্থা, কোনও উদ্যোগ নেই। সরকারি আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই! এই অবস্থায় যা হবার তাই হচ্ছে। অবাধে মানুষকে 'মোরগা বানানো' চলছে।

তাহলে উপায় কী? সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষের হাতে কী উপায় আছে সেটা হাজার ভেবে-চিন্তেও ঠাহর করতে পারি নি। তবে একটা জিনিস করাই যায়। তা হল সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ। যদি কোনো প্রসাধন দ্রব্য দাবি করে, সেটা একটা 'উপকার' সবার জন্য করতে সক্ষম, আর সেই উপকার পেতে ইচ্ছুকদের সংখ্যা অজস্র হয়, তাহলে বুঝতে হবে দাবিটি নেহাত লোকঠকানো। যেমন, এত লোক মাথায় টাক নিয়ে ঘুরছেন, আর কোনও প্রসাধনের বিজ্ঞাপন যদি বলে সবার টাক সারাতে পারে সেই দ্রব্যটি, তাহলে সহজ যুক্তিতেই বোঝা যাচ্ছে— বিজ্ঞাপন মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু সমস্ত প্রসাধনের জন্য তো আর এই সরল যুক্তি চলবে না। সেখানে সরকার এবং ডাক্তার— এ-দুইয়ের শরণাপন্ন না হয়ে গতি নেই। আগেই দেখেছি সরকার এ বাবদে বিশেষ কিছু করে না। আর আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের কাছে আশা করা যেতে পারে তাঁরা ঠিক কথাটা জানবেন এবং বলবেন। প্রসাধন ব্যাপারটা ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞদের আওতায় পড়ে। তাঁদের কাছে গেলে সঠিক পরামর্শ পাবারই সম্ভাবনা। কিন্তু 'মানি পাওয়ার' এখন সর্বত্র সক্রিয়, তাই উঁচুদামের রূপচর্চা কেন্দ্রে যখন ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা 'সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরামর্শ' দিচ্ছেন ও ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তখন সেখানেও একটু খটকা না থেকে পারে না। 'অর্থমনর্থম', অর্থই সকল অনর্থের মূল— কথাটার মধ্যে খানিক সত্যি তো আছেই।

প্রসাধনের অর্থনীতি : ভারতে প্রতি বছরে কসমেটিকস তথা প্রসাধন দ্রব্যের বাজার শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ হারে বাড়ছে। এখন এফ এম সি জি অর্থাৎ ফাস্ট-মুভিং কনজিউমার গুডস, কথাটা খুব শোনা যায়। প্রসাধনদ্রব্য এর আওতায় পড়ে। ভারতে এই জিনিসটির বাজার ২০০৮ সালে ছিল ১৪.৭ বিলিয়ন ডলার, আর চার বছরে ২০১২ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০.০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকা আর ইউরোপের এই বাজার এখন প্রায় সম্পৃক্ত, সেখানে ভারতের অর্ধেক হারেও বৃদ্ধি হচ্ছে না।

অতএব, হে ভারতবাসী, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই বাজারের জন্য বলিপ্রদত্ত। আর সেটা ভুলতে চাইলে খাটনি বিস্তর। প্রসাধনের সংস্কৃতি গোড়া থেকে বুঝতে না পারলে ও তার সঙ্গে টক্কর দেবার ইচ্ছে ও ক্ষমতা না থাকলে, যূপকাষ্ঠই একমাত্র গন্তব্য। এই আলোচনা অন্য পরিসর দাবি করে, অন্য কোনও সংখ্যায় সেই কথাগুলো বলা-শোনা যাবে এমন আশা রইল।

উমা

ওষুধ যখন নুন জল

ভবানীপ্রসাদ সাহু

আমরা বলি— জলই জীবন। আর একটু ঠিকভাবে বললে বলতে হয়— নুনজলই জীবন। তার কারণ এই নুনজলেই একসময় সৃষ্টি হয়েছিল জীবনের। জার্মান মহাকবি গ্যয়টে লিখেছেন— 'আলেস ইস্ট আবস ডেম ভাসার এন্টস্প্রুঙ্গেন,/আলেস ভিয়ার্ড ডুস্ট দাস ভাসার এয়ারহাল্টেন'। মানে জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। জলের দৌলতেই সব কিছু টিকে থাকবে। কথাটা অতিশয়োক্তি নয়।

শহরে পানীয় জলের যথেচ্ছ অপচয় হলেও শহর-গ্রাম, সব জায়গার মানুষই পানীয় জলের উপযোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সে তুলনায় নুনজলের উপকারের খবর রাখিই না। হাসপাতালে রোগীদের স্যালাইন দেয়, এটুকুই যা চোখে পড়ে। অথচ আমাদের জীবনে নানা ভাবে, নানা সময়ে নুনজলই হয়ে ওঠে প্রাণদায়ী। কেন ও কীভাবে তারই বিশ্লেষণ ভবানীপ্রসাদ সাহুর কলমে।

এখন থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রের জলে। প্রাথমিক এককোষী প্রাণী সরাসরি সমুদ্রের জল থেকে অক্সিজেন, লবণ ও অন্যান্য পুষ্টি গ্রহণ করত। আর বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রের জলে ত্যাগ করত। এইভাবে চলতে চলতে প্রায় ২৬ কোটি বছরের বিবর্তনে সৃষ্টি হল বহুকোষী প্রাণী। কিন্তু তখন সব কোষের পক্ষে আর সরাসরি জলের থেকে অক্সিজেন ইত্যাদি সংগ্রহ ও বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ সম্ভব হল না। তাই ভেতরের কোষগুলির প্রয়োজনে জলের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তীস্থানে সৃষ্টি হয় নালিকা, যা দিয়ে সমুদ্রের জল ঢুকত এবং বিভিন্ন কোষ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, লবণ ও অন্যন্য পদার্থ পেত। পরবর্তীকালে আরো বহু কোটি বছরের ধীরগতি বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হতে থাকে জটিলতর বহুকোষী প্রাণী। আর এইভাবেই চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, আদিম মনুষ্যেতর প্রাণী, জাভা মানুষ (পিথেকানথ্রোপাস ইরেকটাস), পিকিং মানুষ (সিনানথ্রোপাস পেকিনেনসিস), নিয়ানডার্থাল মানুষ (হোমো সেপিয়েন নিয়ানডার্থালিস) ইত্যাদির স্তর পেরিয়ে মাত্র ৪০-৫০ হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ (হোমো সেপিয়েন) অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টি।

এই দীর্ঘ বিবর্তনে আদিম প্রাণের বহু কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু সমুদ্রের যে রাসায়নিক পরিমণ্ডলে প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল ঐ পরিমণ্ডলের জল ও অন্যান্য লবণ বিশেষত সোডিয়াম ক্লোরাইড এখনো পৃথিবীতে প্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এখনো বেঁচে থাকতে গেলে ঐ জল ও খাওয়ার নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড (এবং অবশ্যই অন্যান্য পদার্থও) আমাদের গ্রহণ করতে হয়। বিগত কয়েক সাত কোটি বছরে আমাদের রক্ত আদিম ঐ সমুদ্রজ এককোষী প্রাণীর দেহরস থেকে বহু পরিবর্তিত হলেও, আমাদের রক্তের অজৈব উপাদানের সঙ্গে সমুদ্রজলের অজৈব উপাদানের (অর্থাৎ মূলত সোডিয়াম ক্লোরাইডসহ অন্যান্য লবণের) এখনো গভীর টান থেকে গেছে। এবং এক্ষেত্রে সাধারণ নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রধানতম অজৈব লবণ। জল আর নুন ছাড়া কোনো প্রাণী পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না।

আর তাই আন্ত্রিক (ডায়ারিয়া) সহ যে নানা রোগে শরীরে জল ও লবণের ঘাটতি ঘটে, সেক্ষেত্রে জলের সঙ্গে লবণের জোগানও দিতে হয়। (লবণ বলতে এখানে সাধারণভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইডকেই বোঝানো হচ্ছে।) না হলে মৃত্যু অবধারিত।

কারণ লবণের সোডিয়াম আয়ন শারীরবৃত্তীয় নানা কাজকর্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন হৃদপিণ্ডের সংকোচনের পেছনে সোডিয়াম আয়ন মূল্যবান ভূমিকা রাখে। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মাংসপেশীরও সংকোচনের জন্য তা জরুরি। স্নায়ুর উত্তেজনার পেছনেও আছে সোডিয়াম আয়নের ভূমিকা। এছাড়া সমস্ত দেহ কোষের স্বাভাবিক কাজও সোডিয়াম আয়নের জন্যই বজায় থাকে। আর নুন অর্থাৎ সোডিয়ামের ক্লোরাইড লবণ রক্তের অসমোটিক চাপ বজায় রাখে। এর ফলে রক্ত থেকে জলীয় অংশের আদানপ্রদান সম্ভব হয়। অন্ত্র থেকে চর্বি শোষণ করা, শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা, রক্ত প্রস্রাব পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রসের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বকে স্বাভাবিক রাখা, পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করা ইত্যাদি নানা জরুরি কাজও করে সোডিয়ামের নানা লবণ। আর তাই খাদ্য থেকে প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজন ৫ থেকে ১০ গ্রাম নুন। আমাদের শারীরিক ওজনের শতকরা ০.১ ভাগই এই নুন। এবং সোডিয়াম আয়ন মূলত থাকে আমাদের কোষের বাইরের দেহরসে, কোষের ভেতরে থাকে খুবই কম। যেন নোনা দেহরসে ভেসে আছে আমাদের দেহ কোষ, সমুদ্রের নোনাজলে জন্ম নেওয়া আদিম এককোষী প্রাণীর মতো।

সমুদ্রের জলে তথা সোডিয়াম আয়নে থিকথিক করা ঐ পরিমণ্ডলে প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার কারণে সোডিয়াম আয়নের এই ভূমিকা অস্বাভাবিকও নয়। আর শরীরে ঘাটতি ঘটলে তার জোগান দেওয়ার সহজ উপায় হল মুখ দিয়ে খাওয়ানো। এ কারণে

ডায়ারিয়ার চিকিৎসায় ও মৃত্যু-প্রতিরোধে চালু হয়েছে, নুন-জল খাওয়ানো। তবে একথা মনে রাখা দরকার শুধু নুন-জল খাওয়ালে কিন্তু আমাদের অন্ত্র থেকে ঐ নুন ঠিকমত শোষণ হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় শর্করা তথা গ্লুকোজ-এর। এ কারণে ডায়ারিয়া, অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদির সময় 'ও আর এস' (ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন) খাওয়ানো হয় এবং এতে গ্লুকোজও থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী এক লিটার 'ও আর এস'-এ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকার কথা ২.৬ থেকে ৩.৫ গ্রাম এবং গ্লুকোজ থাকার কথা ১৫ থেকে ২০ গ্রাম। আর থাকতে হয় ১.৫ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ২.৯ গ্রাম সোডিয়াম সাইট্রেট। তবে এ প্রসঙ্গে এটিও বলা হয় যে, দোকান থেকে কেনা প্যাকেট থেকে বানানো 'ও আর এস'-এর চেয়ে ভাতের ফ্যান জাতীয় শস্যজাত (যেমন চাল, গম, ভুট্টা আলু ইত্যাদি) তথা স্টার্চ-সমৃদ্ধ তরলে নুন মিশিয়ে খাওয়ালে সেটি ডায়ারিয়ায় অনেক বেশি কার্যকরী। এর কারণ ওই স্টার্চ আমাদের অন্ত্রে বিশেষ ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিডে (শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিডে) রূপান্তরিত হয় এবং এইটি অন্ত্র থেকে সোডিয়াম ও জলের শোষণে অনেক বেশি সাহায্য করে। অন্যথায় জরুরি ক্ষেত্রে বাড়িতেই ফোটানো ও ঠাণ্ডা করা এক গ্লাস জলে এক চিমটে নুন আর এক চামচ চিনি মিশিয়ে 'ও আর এস' বানানো যায়।

এক সময় কলেরা ও আন্ত্রিকে গাঁ-শহর উজাড় হয়ে যেত। এই রোগে মৃত্যুর অন্যতম কারণই ছিল বমি ও পায়খানার সঙ্গে শরীরের জল বেরিয়ে যাওয়া। তাই 'ও আর এস'-কে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক আশ্চর্য আবিষ্কার বললেও কম বলা হয়। এখন ঠিক ভাবে এই নুনচিনির জল খাইয়েই লক্ষ লক্ষ ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। শিরা দিয়েও এই স্যালাইন জল দেওয়া হয়। সাধারণত দেওয়া হয় শতকরা ০.৯ ভাগ (প্রতি ১০০ মিলি লিটারে ০.৯ গ্রাম) ঘনত্বের নর্মাল স্যালাইন। কখনো তার সঙ্গে শর্করা উপাদান মিশিয়ে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন দেওয়া হয়। অন্যদিকে শরীরে কোনো কারণে সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে শতকরা ০.৪৫ ভাগ ঘনত্বের স্যালাইন এবং সোডিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে শতকরা ৩ ভাগ ঘনত্বের স্যালাইন দেওয়ারও প্রয়োজন হয়।

শরীরে জল ও লবণের ঘাটতি হলে প্রাণ বাঁচাতে এইভাবে স্যালাইন বা নুন চিনির জল দেওয়া ছাড়া সাধারণ নুন জলের অন্যান্য শারীরিক ব্যবহারও রয়েছে। এই ধরনের একটি বহুল প্রচলিত ব্যবহার হল নুন জল দিয়ে গার্গল করা ও কুলকুচি করা। নুন জল মৃদু জীবাণুনাশক তথা জীবাণু প্রতিরোধী। তাই নুনজল এইভাবে ব্যবহার করলে মুখ ও গলাকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। গলা ব্যথায় আরামও পাওয়া যায়। দাঁত তোলার পরেও এই কারণে অন্যদিকে অতি সহজ সরল এই নুনচিনি জলের অভাবে মারাও পড়ে অজস্র শিশু।

কিন্তু বমি বা অন্য কোনো কারণে মুখ দিয়ে না খেতে পারলে নুন জল (নর্মাল স্যালাইন) দিয়ে কুলকুচি করার কথা বলা হয়। নুনজল সামান্য গরম করে নেওয়া যায়। তবে বেশি গরম হলে মুখের বা গলার নরম আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এই জলে নুনের পরিমাণও বেশি দেওয়া উচিত নয়। তাহলে বমি হয়ে যেতে পারে, আবরণী কলার ক্ষতিও হয়। অন্য দিকে যাদের উচ্চরক্তচাপ বা কিডনির রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে বারবার এইভাবে নুন জলের ব্যবহার বিপদ ডেকে আনতে পারে, কারণ সামান্য কিছু নুন গার্গল করলে বা কুলকুচি করলে মুখ ও গলা থেকে শোষিত হয়। বারবার ঘটার কারণে যথেষ্ট পরিমাণেই তা শরীরে ঢোকে। ফলে এই ধরনের যে সব ক্ষেত্রে শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিয়ন্ত্রিত করা হয়, ঐ সব ক্ষেত্রে নুন জলের এই ধরনের ব্যবহারে সতর্কতা নেওয়া দরকার। তবে অবশ্যই এক আধবারে এমন কিছু বিপদ ঘটে না।

সাধারণ নুনজলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে বন্ধ নাক খোলা এবং নাকের ভেতরটা পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে নর্মাল স্যালাইনেরও কম মাত্রায় (০.৬৫%) জীবাণুমুক্ত জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মৃদু দ্রবণ ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। অন্যথায় পরিষ্কার জলে সামান্য নুন দিয়ে প্রয়োগ করা যায়। এই জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নেওয়াটা দরকার। কানের খোল পরিষ্কার করার জন্যও নর্মাল স্যালাইন সিরিঞ্জে করে দেওয়া যায়।

চোখ পরিষ্কার করার জন্যও চোখে নর্মাল স্যালাইনের ড্রপ দেওয়া হয়। জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে তাতে ভালো মানের লবণ সদ্য প্যাকেট খুলে সামান্য পরিমাণে মেশানো যায়। নর্মাল স্যালাইনের এক লিটারে থাকে ৯০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাই চোখের (বা নাকের) ড্রপ বানাতে গেলে ১০ মিলিলিটার জল নিলে তাতে ৯ মিলিগ্রাম বা তার কম নুন মেশাতে হবে।

এবং এই ধরনের নুনজল প্রদাহজনিত ও প্রদাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষত পরিষ্কার করতে এবং তার চিকিৎসাতেও ব্যবহার করা যায়। আর এইভাবেই সাধারণ নুনজল দৈনন্দিন জীবনে নানা ছোটখাট শারীরিক সমস্যায় যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি ডায়ারিয়া থেকে শুরু করে অতিরিক্ত ঘাম হয়ে শক অবস্থায় মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে তুলতেও ব্যবহার করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, পানীয় জল যেমন বেশি খাওয়া যায়, নুনজল কিন্তু বেশি খাওয়া বিপজ্জনক। এতে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া থেকে বৃক্ক (কিডনি)-র ক্ষতিসহ নানাবিধ বিপদ ঘটতে পারে। এমনিতেই

সমস্ত প্রাকৃতিক খাদ্যে কমবেশি সোডিয়াম ক্লোরাইড তথা সোডিয়ামের নানাবিধ যৌগ থাকেই। তাই পাঁচমিশালি খাবার খেলে আলাদাভাবে পাতে নুন খাওয়ার অভ্যাস মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। তরকারির স্বাদ আনতে একটু নুন তো মেশানোই হয়। এর পরিমাণও কমের দিকেই রাখা ভালো। আর নানা ভাজাভুজি, ফাস্টফুড, পট্যাটো চিপস ইত্যাদির মতো প্যাকেটবন্দি মুখরোচক নানা খাবারে নুন মেশানো হয়। এর উদ্দেশ্য শুধু ঐ পণ্যটিকে সুস্বাদু করা নয়, তার সংরক্ষণের কাজও (preservative) করে। তাই এই ধরনের খাবার বেশি খেলেও শরীরে নুন তথা সোডিয়াম বেশি ঢুকতে থাকে আর তা আমন্ত্রণ করে আনে উচ্চরক্তচাপ সহ নানা শারীরিক বিপদকে।

আবার এই করতে গিয়ে নুন খাওয়া একেবারে প্রায় বন্ধ করে দিলেও বিপদ। ডায়ারিয়া সহ নানা রোগে হঠাৎ শরীরে জল আর নুন কমে গিয়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি যেমন হতে পারে, তেমনি নুন খুব কম খেলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে শরীরে নুন তথা সোডিয়ামের ঘাটতি ঘটলেও ঘটে নানা বিপত্তি। শরীরে চর্বি কমে যাওয়া, মাংসপেশি ও অণ্ডকোষ শুকিয়ে যাওয়া, ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, হাড়ের বৃদ্ধি কমে যাওয়া, চোখের কিছু স্থায়ী পরিবর্তন ইত্যাদির মতো নানা বিপদই ঘটতে পারে সোডিয়ামের অভাবে।

সব মিলিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের পেছনে নুন আর নুনজলের যেমন রয়েছে মূল্যবান ভূমিকা, তেমনি নুনজলের সুষ্ঠু ব্যবহার অতি স্বল্প ব্যয়ে প্রাণঘাতী নানা অবস্থা আর কিছু দৈনন্দিন শারীরিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও মূল্যবান ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে তার অতিব্যবহারের বিপদও মাথায় রাখা দরকার।

উমা

এক জ্যোতিষ্ক ও তাঁর আবিষ্কারক

সমীর কুমার ঘোষ

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিকে আমরা, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, চিনি না। চেনার কথাও নয়। তিনি কোনো বাইট-বিলাসী বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। টিভি-কাগজে রোজ দেখাও যায় নি। আজীবন মেতে ছিলেন নিখাদ সারস্বত চর্চায়। হুগলির দিগড়া গ্রামে জন্ম, ২৯ অক্টোবর ১৮৫৯। হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় থাকার কারণে পড়াশোনা করতে হয়েছে ঘুরে ঘুরে। শেষে ১৮৮৩-তে কলকাতা থেকে এম এ। প্রথমে ভদ্রেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়িয়ে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে লেকচারার হয়ে চলে যান। এইটুকু জানার পর পাঠক হতাশ হতে পারেন। র‍্যাভেনশ কলেজের শিক্ষককে নিয়ে এত কথা লেখার কোনো মানেই হয় না! প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স, নিদেন স্কটিশ চার্চ বা রিপন কলেজ হলেও না হয় কথা ছিল! এইবার পাঠকের ঠকার পালা। কারণ তাঁর অমূল্য গবেষণাগ্রন্থরাজি। যার মধ্যে উল্লেখ্য, 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ'। এই কাজের জন্য পুরীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্মাণের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়েও তিনি বহু কাজ করেছেন। যার ফসল— 'রত্নপরীক্ষা', 'শঙ্কুনির্মাণ'। 'বাংলা ভাষা', 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', 'শিক্ষা প্রকল্প'— ভাষাছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। 'পূজাপার্বণ', 'ধনুর্বেদ', 'পৌরাণিক উপাখ্যান' বা 'বেদেরে দেবতা ও কৃষ্টিকাল' না পড়লে ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চা ব্যাহত হবে। নানা বিষয়ে তাঁর এরকম বহু বই রয়েছে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে অবাক হতে হয়। জীবদ্দশাতেই তিনি পেয়েছেন বহু সম্মান, পুরস্কার ও সংবর্ধনা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গুণমুগ্ধ ছিলেন তাঁর। এই লেখাটি আসলে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে নিয়ে নয়, ওড়িশার অজ গাঁয়ের এক জ্যোতির্বিদ সামন্ত চন্দ্রশেখরকে নিয়ে। যাঁকে স্থানীয় মানুষ 'পাঠানি চন্দ্রশেখর' বলতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি সামন্ত চন্দ্রশেখরকে নিয়েই লেখা, তবে যোগেশচন্দ্রকে নিয়ে অত ধানাইপানাইয়ের মানে কি! আমরা সামন্ত চন্দ্রশেখরকে না-ই চিনতে পারি, সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহল তাঁকে কুর্নিশ করে। বিশ্বখ্যাত 'নেচার' পত্রিকা চন্দ্রশেখরকে ভেনিস জ্যোতির্বিদ তাইকো ব্রাহের থেকেও এগিয়ে রেখেছিল। এক বর্ণ ইংরেজি জানতেন না। জানতেন শুধু মাতৃভাষা ওড়িয়া আর সংস্কৃত। তাহলে ইংরেজি-জানা বিশ্ব তাঁকে চিনল কী করে? এইখানেই যোগেশচন্দ্রের যাবতীয় কৃতিত্ব। তিনি উদ্যোগ না নিলে চন্দ্রশেখরের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার মাঠে মারা যেত!

যোগেশচন্দ্র কীভাবে চন্দ্রশেখরের খোঁজ পেয়েছিলেন সেই পর্বটা দেখে নিয়ে পাঠানি চন্দ্রশেখরের জীবন ও কাজে যাওয়া যাবে। আগেই বলা হয়েছে, যোগেশচন্দ্রের জ্যোতিষবিদ্যা মানে ভাগ্যগণনা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান— নিয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল। পড়াশোনাও। তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফসল আকর গ্রন্থ— আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। কটকে থাকার সময় তিনি স্থানীয় এক জ্যোতিষের খোঁজ করছিলেন, কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। ওঁর এক বাঙালি বন্ধু ছিলেন, যিনি কটক শহরের আদি বাসিন্দা, প্রচুর পড়াশোনা, খবরাখবরও রাখেন। তিনি জানান, যোগেশচন্দ্র যে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন, কটকে তা দেবার মতো কোনো 'নায়ক' নেই। (ওখানে জ্যোতিষরা 'নায়ক' নামে পরিচিত)। তবে তিনি যদি খণ্ডপাড়ায় যেতে পারেন, সেখানে পাঠানি সন্ত নামে একজন আছেন, উত্তর পেয়ে যাবেন। এই পাঠানি সন্তই হলেন সামন্ত চন্দ্রশেখর। বন্ধুটি আরও জানান, সেই ভদ্রলোক নিজের তৈরি বাঁশের দূরবীন দিয়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখেন। একথা শুনে যোগেশচন্দ্রের তেমন সুবিধের মনে হয় না। শহরের লোক, তার ওপরে কলেজে পড়ান। সম্ভবত ভেবেছিলেন, অজ গাঁয়ের কোনো পাগলের কীর্তি। অতদূর ঠেঙিয়ে যাওয়া মানে বেকার সময় নষ্ট! নিজেই লিখেছিলেন, 'আমার পক্ষে ৬০ মাইল পাহাড় ও জঙ্গল পেরিয়ে বাঁশের দূরবীন দেখতে যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওটা ছিল ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট দূরবীন এবং আমার অনুসন্ধিৎসা ওখানেই শেষ হয়েছিল।' সেবার যোগেশচন্দ্র গেঁয়ো জ্যোতিষের কাছে না গেলেও ঘটনাক্রমে পরে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে। আর তারপরই যোগেশচন্দ্রের বিস্মিত হবার পালা।

এটা যে সময়ের কথা, সেই সময় জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ফলিত দিকটিতে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেত না। পাঁজির বিধানের সঙ্গে বাস্তবের অনেক হেরফের ঘটত। বোঝা যাচ্ছিল, আকাশদেখার ঠিকঠাক যন্ত্রপাতি না থাকলে, গণনাও ঠিকঠাক করা যাবে না। সেই থেকেই শুরু পঞ্জিকা-সংস্কার ভাবনা। কারণ এ দেশের চিরাচরিত সূর্যসিদ্ধান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'ব্রিটিশ নটিক্যাল অ্যালমানাক'-এর দ্বন্দ্ব লেগে গিয়েছিল। প্রাচীনপন্থীরা ছিলেন সূর্যসিদ্ধান্তের পক্ষে, ইংরেজি-জানা নব্যপন্থীরা ব্রিটিশ অ্যালমানাকের। লড়াই

থামাতেই ১৮৮৮ সালে গড়া হয় 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি'। এই কাজের পুরোধা ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। সংস্কৃত কলেজের এই মুক্তমনা পণ্ডিতমশাইয়ের জ্যোতিষ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেই সঙ্গে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার যত টোল ছিল, তিনি তারও কর্তা ছিলেন। ন্যায়রত্ন মশাই জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আছে, এমন সবারই মত চেয়ে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, নিজেও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পণ্ডিতদের খুঁজে বের করে, তাঁদের মতামত নিতে লাগলেন। এই ন্যায়রত্নও খোঁজ পান সামন্ত চন্দ্রশেখরের। যোগেশচন্দ্রও পঞ্জিকা সংস্কার কমিটিতে ছিলেন। ন্যায়রত্ন তাঁকে চন্দ্রশেখরের কাছে যেতে বলেন, তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো যাচিয়ে দেখবার জন্য। চন্দ্রশেখর সম্পর্কে প্রথম থেকেই যোগেশচন্দ্রের উচ্চ ধারণা ছিল না। ভাবখানা ছিল, এক গেঁয়ো জ্যোতিষ বাঁশের দূরবীন বানিয়ে কি মাথামুণ্ডু করছে, দেখতে যাওয়া মানে সময়ের অপচয়। অথচ একথা তিনি মহামহোপাধ্যায়ের মুখের ওপর বলতে পারেন না। এড়িয়ে যেতে চান অন্যভাবে। তাঁর কথায়— 'আমি স্পষ্টতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম এবং যথোচিত শ্রদ্ধাভরেই বললাম, আমার ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান খুবই অল্প এবং আমি সংস্কৃতও জানি না। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বলতে হলেও বলতে পারি ক্যালেন্ডারে কিসব লেখা থাকে তাও আমি বুঝি না। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের আলোচনার মাঝে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।' ভারতীয় ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যা জানি না, সংস্কৃত জানি না— এসব বলে মহামহোপাধ্যায়ের সামনে যোগেশচন্দ্র যতই বিনয় প্রকাশ করুন, তাতে চিঁড়ে ভেজে না। তিনি যোগেশচন্দ্রকে ভাল মতোই চিনতেন। তাই একরকম জোর করেই তাঁর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। অগত্যা যোগেশচন্দ্রকে সামন্ত চন্দ্রশেখরের কাছে যেতেই হয়। ঠিক করেই গিয়েছিলেন, লোকটার জ্ঞানের দৌড় কতটুকু ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। আর সেই পরীক্ষা করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্রের কী হয়েছিল, সে কথাও তিনি অকপট জানিয়েছেন 'আত্মচরিত'-এ। লিখেছেন, 'তিনি জানতেন না, আমি কে এবং আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যও তিনি বুঝতে পারেন নি। এ ঘটনা আমি যখন পরে স্মরণ করেছিলাম, তখন লজ্জায় আমার মাথা নত হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি যাঁর জ্ঞান পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম তাঁর পায়ের কাছে আমি স্বচ্ছন্দে ছাত্র হিসাবে বসার যোগ্য।'

'আমি স্পষ্টতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম এবং যথোচিত শ্রদ্ধাভরেই বললাম, আমার ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান খুবই অল্প এবং আমি সংস্কৃতও জানি না। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বলতে হলেও বলতে পারি ক্যালেন্ডারে কিসব লেখা থাকে তাও আমি বুঝি না। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের আলোচনার মাঝে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী ও গুণী। অন্য জ্ঞানীর সমাদর করতে জানতেন। শহুরে পণ্ডিতি উন্নাসিকতায় চন্দ্রশেখরের কাজকে তিনি উড়িয়ে দিতে পারতেন। তাঁর আবিষ্কার নিজের নামে চালিয়ে দিলেই বা কে ধরত! গ্রামের অখ্যাত জ্যোতির্বিদ সে খবর পেতেনই না, বা পেলেও কিছু করতে পারতেন না। না, যোগেশচন্দ্র তেমন কিছুই করেননি। তাঁর কলেজেরই গণিতের অধ্যাপক মোহিনীমোহন চৌধুরির সঙ্গে চন্দ্রশেখরের কাজের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন ন্যায়রত্ন মশাইকে দিয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর তাঁর তাবৎ গবেষণা তালপাতার পুঁথিতে লিখেছিলেন। তার নাম ছিল 'সিদ্ধান্ত দর্পণ'। যোগেশচন্দ্র বইটি খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ন্যায়রত্ন মশাইকে দেওয়া তথ্যে ওঁরা লিখেছিলেন, 'সিদ্ধান্ত দর্পণে যা দেখেছি এবং এই গ্রন্থের লেখক উড়িষ্যার খণ্ডপাড়ার শ্রীমৎ চন্দ্রশেখরের সাথে কথোপকথন হতে যা বুঝেছি তা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের পুরোনো দিনের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদদের মত ব্যক্তি এখনও অতীত হয়ে যায় নি। চন্দ্রশেখর হলেন একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং তাঁর গ্রন্থ হল এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তিনি তাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া ও সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। বিদেশী ধারণা ও চিন্তার জ্ঞান তাঁর সীমিত এবং ভারনাকুলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ভূগোল বই এর পরিধির বাইরে বিস্তার ছিল না। তিনি শুনেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে এবং তার সাথে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার কিছু ধারণা, যা প্রত্যেক স্কুলছাত্রই জানত। তাঁর পরিশ্রম ও ধৈর্য উল্লেখ করার মত। জ্যোতির্বিদ্যার কোন আধুনিক ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি ছাড়াই এবং উড়িষ্যার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে কেবল মাত্র বুদ্ধির সাহায্যে তিনি হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন সাফল্যের সাথে। এটা উল্লেখ না করে থাকা যায় না যে, 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র কিছু নিত্যরাশি ও ধ্রুবক সংশোধন করার সাহস তিনি দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদের সময়কাল বর্তমান দিনে এক খুবই বিতর্কিত বিষয় এবং সেইজন্যই ভিন্ন ভিন্ন বাঙালী পঞ্জিকাতে তিথির ব্যাপ্তি ও অতিক্রান্তকাল নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে উল্লিখিত চাঁদের দ্রাঘিমাংশ সংশোধনী ছাড়াও চন্দ্রশেখর আরো তিনটি কৌণিক দূরত্বের সংশোধনী।'

যোগেশচন্দ্রেরা আরও জানিয়েছেন, 'বর্তমানে তিনি ৫৭ বছরের প্রবীণ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন অপরিশীলিত ও সাদামাটা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। তাঁর ব্যবহারের যন্ত্রপাতিও অতি সীমিত, তিনটি বা চারটি, যার মধ্যে ছিল ১২টি স্পোকযুক্ত একটি বা দুটি চাকা, যা দিয়ে তিনি পরিমাণ করেন ১২ ভাগে বিভক্ত কাল্পনিক আকাশচক্র বা Zodiac। দ্বিতীয় চাকাটি ছিল ত্রিকোণমিতিক ক্রিয়াকলাপ পরিমাপ করার জন্য। তৃতীয় চাকাটির সাথে একটি ওলন দড়ি, একটি পুরনো তামার clepsydra জলে ডোবান ছিল, যা নক্ষত্র সময়মাপার ঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করা যেত। এইগুলিই ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণাগারের মূল যন্ত্রপাতি। এই যন্ত্রপাতিগুলি বিবেচনা করলে অবাক হতে হয়, তিনি গণিত, পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যার ধ্রুবক ও নিত্যরাশির নির্ভুলতা ও যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রশেখর নির্মাণ কৌশলের অভিনবত্ব দ্বারা নিজেকে এক জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও নিজস্ব দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি করেছেন, তাতে তাঁকে আধুনিক ইউরোপের প্রথমশ্রেণীর জ্যোতির্বিদদের সাথে স্থান দেওয়া যেতে পারে।'

লেখাটি পড়েই ন্যায়রত্ন বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যথার্থ লোককেই চন্দ্রশেখরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জহুরির চোখ ঠিকই রত্ন চিনে ফেলেছে। যোগেশচন্দ্রের আবিষ্কারে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। চন্দ্রশেখরের গবেষণালব্ধ ফল পঞ্জিকা সংস্কারে কাজে লাগে। অচিরেই ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ জেনে ফেলে সামন্ত চন্দ্রশেখরের নাম।

কয়েক পাতা টিকাটিপ্পনী লিখেই ক্ষান্ত হন নি যোগেশচন্দ্র। চন্দ্রশেখরের তালপাতায় লেখা পুঁথি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। সংস্কৃতে লেখা 'সিদ্ধান্ত দর্পণ'-এর একটি ভূমিকাও লিখে দেন ইংরাজিতে। এই বইটিরই পরে সমালোচনা প্রকাশিত হয় বিশ্বখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায়। নেচারে লেখা হয়েছিল 'প্রফে. রয় কম্পেয়ার্স দ্য অথর ভেরি প্রপারলি টু তাইকো। বাট উই শ্যুড ইমাজিন হিম টু বি আ গ্রেটার দ্যান তাইকো।' এরপরই গোটা বিশ্ব জানতে পারে অখ্যাত এক ভারতীয় জ্যোতির্বিদের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী।

আবার ফিরি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কথায়। গবেষণা, বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সুধী সমাজকে তাঁর উদ্দেশে সেলাম ঠুকতেই হবে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে সামন্ত চন্দ্রশেখরের মতো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে আবিষ্কারের জন্য।

(ক্রমশ)

২১.৮.২০১৩

মাননীয় সম্পাদক,
উৎস মানুষ
মহাশয়,

উৎস মানুষ (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৩) প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। কয়েকটি বিষয়ে ব্যক্তিগত মত জানাচ্ছি—

১) সংগঠন সংবাদ বিভাগে 'রাধানাথ স্মরণ' শিরোনামে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। প্রথমটির সাযুজ্যে শিরোনাম হলেও দ্বিতীয়টিকে একই পঙক্তিতে আনা হয়েছে। প্রথম অনুষ্ঠানের তারিখটি উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

২) আনন্দ সংবাদ 'মূল্যবোধ' নিয়ে উৎস মানুষের প্রয়াসের উল্লেখ (২৮ পাতা)। নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 'সরল বিশ্বাস' নামের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩) পুস্তক পর্যালোচনা বিভাগে আলোচিত পুস্তকটির প্রকাশকের নাম উল্লিখিত হয় নি।

৪) গৌতম মিস্ত্রির রচনা 'শরীরচর্চাই শেষ কথা' সময়োপযোগী রচনা। তবে রচনার শিরোনামে প্রশ্নচিহ্ন কেন? তবে কি লেখক শরীরচর্চা প্রসঙ্গে নিজেই সন্দিহান।

৫) উত্তরাখণ্ডের বিষয়ের প্রসঙ্গে লেখক সমীরকুমার ঘোষ রচনার শেষে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা মেলাতে চেয়েছেন। বিষয়টি তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা এই যুক্তির সপক্ষে চাই। তবেই ধারণা স্বচ্ছ হবে।

৬) আমাদের কথায় আছে— 'আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী এবং কয়েকজনের আবদারে একরকম জোর করেই ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছে।' এই বিষয়ে বিচার ব্যবস্থাকে আড়াল করা হল বলে মনে হয়।

বিনীত
সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

সংগঠন সংবাদ

এক নমস্যার প্রয়াণ

প্রয়াতা জয়ধ্বনি বিশ্বাসের স্মরণে এক পারিবারিক স্মৃতিচারণানুষ্ঠান হল নারায়ণপুর গ্রামে, ১৮ আগস্ট, রবিবার, বেলা ৩টোয়।

স্মৃতিচারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন নগরউখরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরিন্দম ভৌমিক। প্রয়াতা জয়ধ্বনি বিশ্বাসের (১০১) স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রতিকৃতিতে সকলেই পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সম্মান জানান। এবং সম্মিলিত কণ্ঠে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রথমে স্মৃতিচারণ করেন হরিণঘাটা এলাকায় বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে নিরলস কর্মী, প্রয়াতার জ্যেষ্ঠ্যপুত্র নিরঞ্জন বিশ্বাস (৭২)। তিনি বলেন, তাঁর গত ৬ আগস্ট ২০১৩ মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে তাঁর কালিবাজার বাসভবনে বয়সজনিত কারণে প্রয়াত হয়েছেন। প্রথমেই তার মায়ের সংসারের প্রতি ত্যাগ, ভালবাসা ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা বলেন। বলেন ছোট থেকে মায়ের কাছে অকৃত্রিম স্নেহ আদর ও আদর্শ শিক্ষা পাওয়ার কথা। নিরঞ্জনবাবু বলেন, শিশুকালে মায়ের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা তার ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকালে বিশ্বমানের শিক্ষকদের কাছে পাওয়া শিক্ষার চেয়েও বড় মনে হয়। প্রয়াতার কনিষ্ঠ পুত্র সুনীলকুমার বিশ্বাস ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্পনা বিশ্বাস তাঁদের মা ও শাশুড়ী মায়ের জীবনের সাথে জীবন যোগের স্মৃতিগুলো উদ্ধৃত করে বক্তব্য রাখেন। পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অনেকে। স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করেন বিমল বিশ্বাস। সকলের স্মৃতিতেই প্রয়াতা জয়ধ্বনি বিশ্বাসের অনাড়ম্বর জীবন, সরলতা ও কোমল হৃদয়ের কথা মূর্ত হয়ে প্রকাশ পায়। তাঁর জীবদ্দশায় সর্বক্ষণের চিকিৎসক ও প্রিয়পাত্র ডাঃ সুশীলচন্দ্র বিশ্বাস এবং ডাঃ গিরিধর বিশ্বাস প্রয়াতার দীর্ঘ জীবনের কর্মকাণ্ডের সপ্রশংস বক্তব্য রাখেন এবং আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই ধরনের উদ্যোগের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। বিজ্ঞানভাবনা পত্রিকার (বহরমপুর) পক্ষ থেকে আগত দিলীপ দাস (সম্পাদক) ও বিদেশ মণ্ডলরা বলেন সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সামাজিক অবক্ষয়, তার মধ্যেও এই ধরনের অনুষ্ঠানে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন তাঁদেরকে জোরালো সমর্থন ও ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় নেই। আগামী দিনে তাঁরাও পাশে আছেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, জয়ধ্বনি দেবীর শেষকৃত্যানুষ্ঠান ছিল পুরানো ধ্যানধারণা বর্জিত। বাড়ির সীমানা পর্যন্ত গোবর গোলা জল ছেটানো, সারা রাস্তা খই, পয়সা ছড়ানো, বীভৎস চিৎকারে বলহরি বোল ধ্বনি, শ্মশানে গিয়ে মরদেহে তেল ঘৃতাদি দ্বারা শ্মশানে স্থাপন করা জলের কলসি এক আঘাতে ভাঙা এবং লোহার চাবি সহ কাছাকোছা ধারণ কিছুই পালন করা হয় নি।

সতীশচন্দ্র মণ্ডল

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুণ্ডু

২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ৭০০০১২

(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

উৎস মানুষ

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি সংখ্যা বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন **UBI** কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 700073.
Utsa Manush,
SB Account No. 0083010748838।
IFSC No. UTBIOCOL108

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

এবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে বইমেলায়।

পুস্তক তালিকা

- বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন — ৪২.০০
- প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত — ৩০.০০
- তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী — ১৮.০০
- বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী — ৪০.০০
- এটা কী ওটা কেন সংকলন — ৫০.০০
- যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — ৫০.০০
- আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন — ৫০.০০
- আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু — ২০.০০
- প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়) — ৬০.০০
- বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক — ১০০.০০
- শেকল ভাঙা সংস্কৃতি — ৬০.০০
- প্রমিথিউসের পথে — ৩৫.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)। বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১। জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফিহাউসের উল্টোদিকে)। থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০২৬।